সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ও সূচিপত্র	১
ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহর আবির্ভাব এবং তাঁর সত্যতার বিষয়ে কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ	২
ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আ.) সম্পর্কে সৈয়্যদানা হযরত মহম্মদ (সা.)-এর পবিত্র বাণী	৩
হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী	৪
হুযুর আনোয়ার (আই.) কর্তৃক প্রদত্ত জুমার খুতবা	৫
পারিবারিক জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ঘটনার আলোকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জীবনী	১১
হজরত খলীফাতুল মসীহ খামিস (আই.)-এর গৃহীত দোয়া সমূহের ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী।	১৬
“বাশারাহ্ চাঁদা ও ওসীয়্যতের ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও কল্যাণ সমূহ”	২৩
হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর অতুলনীয় ধৈর্য ও অবিচলতা	২৬

সম্পাদকীয়

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দাবির সত্যতা

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার স্বপক্ষে যতকিছুই বলা হোক তা যথেষ্ট হবে না। আজও পৃথিবীর একটি বিশাল অংশের বিপুল সংখ্যক মানুষ তাঁর উপর ঈমান আনা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু এতে হতাশার কোন কারণ নেই। যুক্তি-প্রমাণ এবং দলিলের ক্ষেত্রে আমরা বিজয় লাভ করেছি এবং এই ময়দান একশ বছরের অধিককাল থেকে আমাদের আয়ত্বে আছে আর তা চিরকাল আমাদের হাতেই থাকবে। যতদূর সংখ্যার বিচারে আধিপত্যের প্রশ্ন, সেদিনটিও আর দূরে নয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) জামাত আহমদীয়ার সংখ্যার দিক থেকে বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা এই জামাতকে সমস্ত দেশে বিস্তৃতি দান করবেন এবং অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের দৃষ্টিকোণ থেকে সকলের উপর বিজয় দান করবেন। যেরূপ পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আমরা যুক্তি-প্রমাণের জয় ইতিমধ্যেই অর্জন করেছি। সংখ্যার বিচারে আধিপত্যের জন্য যে সময় ও যুগের প্রশ্ন ওঠে যে কবে তা অর্জিত হবে, সে সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

‘ আজ থেকে তিন শতাব্দী অতিক্রান্ত হতে না হতে ঈসা (আ.)-এর অপেক্ষাকারীরা, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, সকলে অত্যন্ত হতাশ ও বিরক্ত হয়ে মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে তখন পৃথিবীতে একটিই ধর্ম হবে এবং একই নেতা হবে। আমি তো একটি বীজ বপন করতে এসেছি। সুতরাং আমার হাত দ্বারা ঐ বীজ বপন করা হয়েছে। এখন এটা বৃদ্ধি লাভ করবে এবং বিকশিত হবে। কেউ একে প্রতিহত করতে পারবে না।

(তাযকেরাতুশ শাহাদাতাঈন, খণ্ড- ২০, পৃ: ৬)

তাযকেরাতুশ শাহাদাতাঈন ১৯০৩ সালের রচনা। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পর একশ পনের বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। তিন শতাব্দী পূর্ণ হতে একশ পঁচাশি বছর অবশিষ্ট রয়েছে। একশ পঁচাশি বছর পর সমগ্র বিশ্বে জামাত আহমদীয়ার আধিপত্য হবে। আল্লাহ্ তা'লা চাইলে এর থেকে কম সময়েও আহমদীয়াত পৃথিবীতে জয়যুক্ত হবে। আমরা আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই আশাই রাখি যে এবং দোয়া করি যে, হে আল্লাহ্ ইসলাম আহমদীয়াতের বিজয়ের দিন আমাদের জন্য নিকটতর করে দাও। আমীন।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার অজস্র যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে। কোনটি বর্ণনা করব আর কোনটি করব না, বুঝে ওঠা কঠিন। যে দিক থেকেই বিশ্লেষণ করি, তা থেকে তাঁর সত্যতাই ফুঠে ওঠে। কাদিয়ানের জনপদ থেকে যে ক্ষীণ কণ্ঠ উত্থিত হয়েছিল, তা আজ পৃথিবীর ২১২ টি দেশে পৌঁছে গেছে। পৃথিবী আজ জামাতের সম্পর্কে পরিচিত হচ্ছে এবং জামাতকে এক বিশেষ সম্মান ও সমাদরের দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। সৈয়্যাদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস বিভিন্ন দেশের সংসদে ভাষণের মাধ্যমে ইসলামের অপূর্ব সুন্দর শিক্ষা এবং শান্তিপূর্ণ বাণী বারংবার উপস্থাপন করেছেন। পৃথিবীকে তাঁকে শন্তি-দূত হিসেবে চেনে এবং একথা স্বীকার করে যে, আজ পৃথিবীকে তাঁর নেতৃত্ব, বাণী ও পথ-প্রদর্শনের প্রয়োজন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) সম্প্রতি ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে আমেরিকা ও গোয়েতামালার সফর করেন। ২১ শে অক্টোবর তারিখে হুযুর আনোয়ার হিউস্টন রওনা হন। ২:৪৫ টায় ইউনাইটেড এয়ারলাইন-এর UA484 বিমানে করে ওয়াশিংটনের ডালাস বিমান বন্দর থেকে হিউর্স্টনের জর্জ বুশ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। বিমান আকাশে পাড়ি দেওয়ার কিছুক্ষণ পর পাইলট কেবিন থেকে ঘোষণা হয়-‘ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ আমাদের বিমানে সফর করছেন। আমরা তাঁকে স্বাগত জানাই।’ এই বার্তাও দেওয়া হয় যে, হুযুর শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্ব-দূত। তিনি পৃথিবীতে ধর্মীয় স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত।

আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দাবীর সত্যতা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম যে, তাঁর সত্যতার অজস্র দলিল রয়েছে। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী, উম্মতের বুযুর্গদের উক্তি, স্বয়ং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া, তাঁর মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া নিদর্শনাবলী, জামাতের উন্নতি ও বিস্তৃতি লাভ, জামাতের সংগঠন, প্রচার ও প্রসারের কাজ, এক খিলাফতের হাতে একত্রি হওয়া, মুবাল্লিগ ও মুয়াল্লিম, পৃথিবীর একাধিক দেশে বাৎসরিক জলসার আয়োজন হওয়া এবং সেগুলির প্রভাব, শত্রুরা লাঞ্ছিত ও ব্যর্থ হওয়া- এগুলি সবই তাঁর সত্যতাকে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট করে দেয়।

নিম্নে শত্রুদের লাঞ্ছনা ও অপদস্ততা এবং ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কতিপয় ঈমান উদ্দীপক বর্ণনা তুলে ধরা হল।

মসীহ মওউদ সম্পর্কে যে ব্যক্তিই মৃত্যু সংক্রান্ত ইলহাম প্রকাশ করেছে, সেই মারা গেছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

“অনেকে মসজিদে আমার মৃত্যু কামনায় নাক ঘসতে থেকেছে। অনেকে আবার যেমন মৌলবী গোলাম দস্তগীর কসুরী নিজের পুস্তকে এবং আলিগড় নিবাসী মৌলবী ইসমাঈল আমার সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দাবি করে যে, সে মিথ্যাবাদী হলে আমার পূর্বে মারা যাবে এবং অবশ্যই আমার পরে মারা যাবে কেননা সে মিথ্যাবাদী। কিন্তু যখন তারা নিজেদের রচনা জনসমক্ষে প্রকাশ করে ফেলে, তখন অচিরে তারাই মারা গেল। এইভাবে তাদের মৃত্যু সিদ্ধান্ত করে দিয়ে গেল যে, মিথ্যাবাদী কে ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা শিক্ষা গ্রহণ করে না। লাখুকের মহিউদ্দীন আমার সম্পর্কে মৃত্যুর ইলহাম প্রকাশ করে সে মারা গেল। মৌলবী ইসমাঈল প্রকাশ করে সেও মারা গেল। মৌলবী গোলাম দস্তগীর একটি পুস্তক রচনা করে নিজের মৃত্যুর পূর্বে আমার মৃত্যুর জোরালো দাবি করল এবং মারা গেল। পাদ্রী হামীদুল্লাহ্ পেশাওয়ারী আমার মৃত্যুর জন্য দশ মাসের মেয়াদ নির্ধারণ করে ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করেছিল অতঃপর সেও মারা গেল। লেখরাম আমার মৃত্যুর জন্য তিন বছরের মেয়াদ রেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। সেও মারা গেছে। এটি কি মহান নিদর্শন নয়?

(তোহফা গোল্ডবিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃ: ৪৫)

‘অনেকে আমার মৃত্যু কামনা করে মসজিদে নাক ঘসতে থেকেছে। অনেকে, যেমন মৌলবী গোলাম দাস্তগীর এবং আলিগড়ের মৌলবী ইসমাঈল নিজেদের পুস্তকে আমার সম্পর্কে চূড়ান্ত বাজি রাখে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে প্রথমে মারা যাবে এবং অবশ্যই আমার পূর্বে মারা যাবে। কেননা সে মিথ্যাবাদী। কিন্তু তারা নিজেদের পুস্তক সারা বিশ্বে প্রচার করার পর নিজেরাই মারা গেল। আর মৃত্যুই মীমাংসা করে দিয়ে গেল যে, মিথ্যাবাদী কে ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা শিক্ষা গ্রহণ করে না। বস্তুতঃ মহিউদ্দীন লাখোকে আমার সম্পর্কে মৃত্যুর ইলহাম প্রকাশ করে নিজেই মারা গেল, অতঃপর মৌলবী ইসমাঈলও মারা গেল। মৌলবী গোলাম দস্তগীর একটি পুস্তক রচনা করে তার মৃত্যুর পূর্বে আমার মৃত্যু সংক্রান্ত দাবি অত্যন্ত দাপটের সঙ্গে প্রকাশ করে। সেও মারা গেল। পাদ্রী হামীদুল্লাহ্ পেশাওয়রী আমার মৃত্যুর জন্য দশ মাসের সময় নির্ধারণ করে ভবিষ্যদ্বাণী

এরপর শেষের পাতায়

যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহা হইলে তাহার মিথ্যার প্রতিফল তাহারই উপর বর্তিবে; আর যদি সে সত্যবাদী হয় তাহা হইলে সে তোমাদিগকে যে (সমস্ত আযাব সম্বন্ধে) ভয় প্রদর্শন করিতেছে, উহার কিয়দংশ অবশ্যই তোমাদের উপর বর্তিবে।

۞ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

অনুবাদ: তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিবেন যেভাবে তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং অবশ্যই তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের দীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন যাহাকে তিনি তাহাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন, এবং তাহাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর উহাকে তিনি তাহাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করিয়া দিবেন; তাহারা আমার ইবাদত করিবে, আমার সঙ্গে কোন কিছুকেই শরীক করিবে না। এবং ইহার পর যাহারা অস্বীকার করিবে, তাহারাই হইবে দুষ্কৃতকারী।

(সূরা-নূর, আয়াত: ৫৬)

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

" হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল থেকে আল্লাহ্ তা'লার বিধান হচ্ছে, তিনি দুটি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীদের দুটি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান; সুতরাং খোদা তা'লা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন এখন তা সম্ভবপর নয়। এজন্য আমি তোমাদেরকে যে কথা বলছি তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমণ তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, এটা স্থায়ী, এর ধারবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু আমি যখন চলে যাবো, খোদা তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে।"

(আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড- ২০, পৃ: ৩০৫)

۞ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ○ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ○ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ○ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ○

অনুবাদ: এবং সে যদি কোন কথা মিথ্যা রচনা করিয়া আমাদের প্রতি আরোপ করিত, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তাহাকে ডান হাতে ধৃত করিতাম, অতঃপর আমরা তাহার জীবন-শিরা কাটিয়া দিতাম, তখন তোমাদের মধ্য হইতে কেহই তাঁহার (আযাব) হইতে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিত না।

(সূরা-হাকা, আয়াত: ৪৫-৪৮)

"খোদা তা'লা কুরআন শরীফে এক উন্মুক্ত তরবারির মত এই আদেশ দেন যে, এই নবী যদি আমার উপর মিথ্যা রটনা করে তবে তার জীবন শিরা ছিন্ন করে দিতাম এবং এত দীর্ঘকাল সে জীবিত থাকতে পারত না। আমরা যখন আমাদের মসীহ মওউদ কে এই মানদণ্ডে বিচার করি, তখন বারাহীনে আহমদীয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হওয়ার এবং ঐশী বাক্যালাপের এই দাবি প্রায় ত্রিশ বছর থেকে আর বারাহীনে আহমদীয়া প্রকাশিত হওয়া একুশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। অতএব এত দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই মসীহ্র ধ্বংস না হয়ে অক্ষত থাকা যদি তার সত্যতার প্রমাণ না হয়, তবে এর আবশ্যিক প্রতিপাদ্য এই দাঁড়ায় যে, (নাউযুবিল্লাহ্) আঁ হযরত (সা.)-এর তেইশ বছর মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া তাঁর সত্যতার প্রমাণ নয়। কেননা, খোদা তা'লা এখানে একজন মিথ্যা নবুয়তের দাবিদারকে ত্রিশ বছর অব্যহতি দান করেছেন এবং لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا এর ওয়াদা অনুযায়ী সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষো করলেন, তবে (নাউযিবিল্লাহ) এও সম্ভব যে, আঁ হযরত (সা.) কেও মিথ্যাবাদী হওয়া সত্বেও অব্যহতি দান করা হয়েছিল। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) মিথ্যাবাদী হওয়া অসম্ভব। ....স্পষ্টতই কুরআনের যুক্তি একমাত্র তখনই সজ্ঞাত হিসেবে প্রতিপন্ন হতে পারে যখন এই সাধারণ নিয়ম হিসেবে ধরে নেওয়া হয় যে, খোদা সেই মিথ্যারচনাকারীকে কখনওই অব্যহতি প্রদান করেন না, যে তাঁর সৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করতে নিজেকে আল্লাহ্র প্রত্যাদিষ্ট বলে দাবী করে। কেননা এমনটি হলে তাঁর রাজত্বে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা দেখা দিত এবং সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মধ্যে প্রভেদ মুছে যেত।

(রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, তোহফা গোল্ডবিয়া, পৃ: ৪২)

۞ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ○ (المؤمن:29)

অনুবাদ: এবং ফেরাউনের বংশ হইতে এক ঈমানদার ব্যক্তি, যে নিজ ঈমানকে গোপন করিতেছিল, বলিল, 'তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এইজন্য হত্যা করিবে যে বলে, 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ্' অথচ সে তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে স্পষ্ট নিদর্শন আনিয়াছে? এবং যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহা হইলে তাহার মিথ্যার প্রতিফল তাহারই উপর বর্তিবে; আর যদি সে সত্যবাদী হয় তাহা হইলে সে তোমাদিগকে যে (সমস্ত আযাব সম্বন্ধে) ভয় প্রদর্শন করিতেছে, উহার কিয়দংশ অবশ্যই তোমাদের উপর বর্তিবে। নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারী, ঘোর মিথ্যাবাদীকে আল্লাহ্ কখনও সৎপথে পরিচালিত করেন না।"

(সূরা-মোমেন, আয়াত: ২৯)

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

" খোদা তা'লার পুণ্যবান ও প্রত্যাদিষ্টদের মোকাবেলায় সমস্ত ধরণের চেষ্টা করা হয় তাদেরকে দুর্বল করার জন্য। কিন্তু খোদা তাদের সঙ্গে থাকেন। তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এমতাবস্থায় কিছু সৎপ্রকৃতির এবং পুণ্যাত্মাও থাকেন যারা বলেন, وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ؕ সত্যবাদীদের সত্য নিজেই তার জন্য বলিষ্ঠ প্রমাণ হয়ে থাকে। আর মিথ্যাবাদীর মিথ্যাই তাকে ধ্বংস করে দেয়। তাই এদেরকে আমার বিরোধীতা করার পূর্বে অন্ততঃপক্ষে এতটা বিবেক করা উচিত ছিল। কেননা, খোদা তা'লার কিতাবে সত্যতা যাচাইয়ের এই একটি পথ রাখা হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, এরা কুরআন পাঠ করে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠের নীচে নামে না। "

(তফসীর হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিসসালাম, ৩য় খণ্ড, তফসীর সূরা মুমেনুন, পৃ: ১৯৯)

****

তোমাদের মধ্যে যে জীবিত থাকবে সে (ইনশাআল্লাহ্) ঈসা ইবনে মরিয়মের যুগ পাবে। তিনিই ইমাম মাহদী, ‘হাকাম’ (ন্যায় বিচারক) ও ‘আদল’ (মীমাংসাকারী) হবেন যিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন এবং শুকর বধ করবেন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

۞ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰی یَنْزِلَ عِیْسَی بْنُ مَرْیَمَ حَکَمًا مُقْسِطًا وَاِمَامًا عَدْلًا فَیَکْسِرُ الصَّلِیْبَ وَیَقْتُلُ الْخِنْزِیْرَ وَیَضَعُ الْجِزْیَةَ وَیَفِیْضُ الْمَالَ حَتّٰی لَا یَقْبَلَهٗ اَحَدٌ۔

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারী হিসেবে ঈসা ইবনে মরিয়ম যতদিন পর্যন্ত আবির্ভূত না হবেন কিয়ামত আসবে না। (আবির্ভূত হলে) তিনি ক্রুশ ভঙ্গ করবেন, শুকর বধ করবেন, জিযিয়া প্রথার অবসান ঘটাবেন এবং ধন-সম্পদ বিতরণ করবেন যা মানুষ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হবে না।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল ফিতন, বাব ফিতনাতুদ দাজ্জাল ও খুরুজ ঈসা ইবনে মরিয়ম)

۞ عَنْ حُذَیْفَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : تَکُوْنُ النُّبُوَّةُ فِیْکُمْ مَا شَآءَ اللّٰهُ اَنْ تَکُوْنَ ثُمَّ یَرْفَعُهَا اللّٰهُ تَعَالٰی ثُمَّ تَکُوْنُ خِلَافَةٌ عَلٰی مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ مَا شَآءَ اللّٰهُ اَنْ تَکُوْنَ ثُمَّ یَرْفَعُهَا اللّٰهُ تَعَالٰی ثُمَّ تَکُوْنُ مُلْکًا عَاضًّا فَتَکُوْنُ مَا شَآءَ اللّٰهُ اَنْ تَکُوْنَ ثُمَّ یَرْفَعُهَا اللّٰهُ تَعَالٰی ثُمَّ تَکُوْنُ مُلْکًا جَبْرِیَّةً فَیَکُوْنُ مَا شَآءَ اللّٰهُ اَنْ یَکُوْنَ ثُمَّ یَرْفَعُهَا اللّٰهُ تَعَالٰی ثُمَّ تَکُوْنُ خِلَافَةٌ عَلٰی مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَکَتَ (مسند احمد، جلد 4، صفحہ 273، مشکوٰۃ باب الانذار والتحذیر، حدیقۃ الصالحین، صفحہ 928)

হযরত হুযাইফা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে নবুয়ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতদিন আল্লাহ্ তা’লা চাইবেন। অতঃপর তিনি তা উঠিয়ে নিবেন এবং নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ্ সেটিও উঠিয়ে নিবেন যখন ইচ্ছা করবেন। এরপর তাঁর তকদীর অনুসারে যন্ত্রনাদায়ক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে (মানুষ যার প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে এবং পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ব্যকুল হয়ে উঠবে) এই যুগের পর তাঁর দ্বিতীয় তকদীর অনুসারে এর থেকে অত্যাচারী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। অবশেষে আল্লাহ্ ত’লার করুনা উদ্বেলিত হবে এবং এই অত্যাচার ও উৎপীড়নের যুগের অবসান ঘটবে। এরপর পুনরায় নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। এতটুকু বলার পর আঁ হযরত (সা.) নীরব হয়ে যান।

(মসনদ আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৭৩, মিশকাত বাব আল ইনযার ওয়াততাখযির, হাদীকাতুস সালেহীন, পৃ: ৯২৮)

۞ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ یَمَانٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا مَضَتْ اَلْفٌ وَ مِائَتَانِ وَاَرْبَعُوْنَ سَنَةً یَبْعَثُ اللّٰهُ الْمَهْدِیَّ (النجم الثاقب، جلد 2، صفحہ 209)

হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামন (রা.) বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: ১২৪০ (বছর) আল্লাহ্ তা’লা মাহদীকে প্রেরণ করবেন।

(আন নাজমুস সাকিব, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০৯)

****

۞ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَیْفَ اَنْتُمْ اِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْیَمَ فِیْکُمْ وَاِمَامُکُمْ مِنْکُمْ وَفِیْ رِوَایَةٍ فَاَمَّکُمْ مِنْکُمْ

হযযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন: সেই সময় তোমাদের অবস্থা কিরূপ হবে যখন তোমাদের মধ্যে ইবনে মরিয়ম আবির্ভুত হবেন, যিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের ইমাম হবেন। অপর এক রেওয়াত অনুসারে বর্ণিত হয়েছে যে, তোমাদের মধ্য থেকে হওয়ার কারণে তিনি তোমাদের ইমামতির কর্তব পালনা করবেন।

(বুখারী কিতাবুল আম্বিয়া, বাব নুযুল ঈসা ইবনে মরিয়ম)

۞ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : ذَکَرَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ..... أَرَانِیْ اللَّیْلَةَ عِنْدَ الْکَعْبَةِ فِی الْمَنَامِ فَاِذَا رَجُلٌ اٰدَمُ کَاَحْسَنِ مَا یُرٰی مِنْ اُدْمِ الرِّجَالِ تَضْرِبُ لِمَّتُهٗ بَیْنَ مَنْکِبَیْهِ رَجِلُ الشَّعَرِ یَقْطُرُ رَأْسُهٗ مَآءً وَاضِعًا یَدَیْهِ عَلٰی مَنْکِبَیْ رَجُلَیْنِ وَهُوَ یَطُوْفُ بِالْبَیْتِ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالُوْا هٰذَا الْمَسِیْحُ ابْنُ مَرْیَمَ ثُمَّ رَاَیْتُ رَجُلًا وَرَاءَهٗ جَعْدًا قَطَطًا اَعْوَرَ عَیْنِ الْیُمْنٰی کَاَشْبَهِ مَنْ رَاَیْتُ بِابْنِ قَطَنٍ وَاضِعًا یَدَیْهِ عَلٰی مَنْکِبَیْ رَجُلٍ یَطُوْفُ بِالْبَیْتِ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالُوْا هٰذَا الْمَسِیْحُ الدَّجَّالُ (بخاری، کتاب الانبیاء، باب واذکر فی الکتاب مریم اذانتبذت من اهلها

হযরত নাফে বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, এক রাত্রি স্বপ্নে আমি নিজেকে পবিত্র কাবার কাছে অবস্থান করতে দেখি যেখানে এক গোধুমি বর্ণের সুশ্রী চেহারার মানুষ ছিল, যার কেশগুচ্ছ কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছিল যা এতটা সোজা ও ঝকঝকে পরিস্কার ছিল, দেখে মনে হচ্ছিল যেন পানির ফোঁটা চুইয়ে পড়ছে। তিনি দুই ব্যক্তির কাঁধে হাত রেখে কাবাকে প্রদিক্ষণ করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে এই ব্যক্তি? লোকেরা উত্তর দিল, মসীহ ইবনে মরিয়ম। অতঃপর তাঁর পিছনে আমি ইবনে কাতানের চেহারা সদৃশ আরেক ব্যক্তিকে দেখতে পাই যার চুল ছিল কোঁকড়ানো, শুষ্ক ও কঠিন ত্বক এবং দক্ষিণ চক্ষু অন্ধ। সে এক ব্যক্তির দুই কাঁধে হাত রেখে খানা কাবাকে প্রদিক্ষণ করছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই ব্যক্তি কে? লোকেরা উত্তর দিল, মসীহ্র দাজ্জাল। (স্বপ্নে মহানবী (সা.) কে এই দৃশ্য দেখানো হয়। কাবাকে প্রদিক্ষণ করা বলতে বোঝানো হয়েছে মসীহ বায়তুল্লাহ্র নিরাপত্তা এবং মর্যাদা সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট থাকবেন অপরদিকে দাজ্জাল কাবাকে ধ্বংস করতে উদ্যত হবে)

(বুখারী কিতাবুল আম্বিয়া, বাব ওয়াযকুরু ফিল কিতাবে মারইয়ামা)

● یُوْشِكُ مَنْ عَاشَ مِنْکُمْ اَنْ یَّلْقٰی عِیْسَی بْنَ مَرْیَمَ اِمَامًا مَهْدِیًّا حَکَمًا عَدْلًا یَکْسِرُ الصَّلِیْبَ وَیَقْتُلُ الْخِنْزِیْرَ -

তোমাদের মধ্যে যে জীবিত থাকবে সে (ইনশাআল্লাহ্) ঈসা ইবনে মরিয়মের যুগ পাবে। তিনিই ইমাম মাহদী, ‘হাকাম’ (ন্যায় বিচারক) ও ‘আদল’ (মীমাংসাকারী) হবেন যিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন এবং শুকর বধ করবেন।

(মসনদ আহমদম ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫৬, উদ্ধৃতি হাদীকাতুস সালেহীন, হাদীস: ৯৪৮)

চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে খোদা তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে এই অধমকে প্রেরণ করেন এবং সেই আসমানী অস্ত্র প্রদান করেন যার দ্বারা আমি ক্রুশ ধ্বংস করতে পারি।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আমার কোন বিশ্বাস আল্লাহ্ তা'লা এবং মোহাম্মদ (সা.) থেকে বর্ণিত বাণীর পরিপন্থী নয়।

"অবশেষে আমি মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'লার কসম খেয়ে সাধারণ মানুষের সামনে এই কথা প্রকাশ করছি যে, আমি কাফির নই। لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এবং لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ -এর উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। যতগুলি আল্লাহ্তা'লার নাম রয়েছে, যতগুলি কোরআন শরীফে বর্ণ রয়েছে, ততবার আমি আমার ঈমানের সত্যতার উপর কসম খেতে পারব। আমার কোন বিশ্বাস আল্লাহ্ তা'লা এবং মোহাম্মদ (সা.) থেকে বর্ণিত বাণীর পরিপন্থী নয়। যে ব্যক্তি এই রূপ ধারণা রাখে, সে বিভ্রান্তিতে রয়েছে। যে ব্যক্তি আমাকে এখনও কাফির মনে করে এবং অস্বীকার করা থেকে বিরত হয় না, তার স্মরণ রাখা উচিত যে, মৃত্যুর পর অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লা তাকে জিজ্ঞাসা বাদ করবেন।

(কিরমাতুস সাদিকীন, রূহানী খাযায়েন, ৭ম খণ্ড, পৃ; ৬৭)

খোদা তা'লার কসম খেয়ে বলছি, আমি এবং আমার জামাত মুসলমান

আমি যথার্থতার সঙ্গে খোদা তা'লার কসম খেয়ে বলছি, আমি এবং আমার জামাত মুসলমান। তারা আঁ হযরত (সা.) এবং কুরআন করীমের উপর সেভাবে ঈমান রাখে যেভাবে একজন সত্যিকার মুসলমানের রাখা উচিত। আমি এক বিন্দু পরিমাণও ইসলামের বাইরে পা রাখাকে ধ্বংসের কারণ বলে বিশ্বাস করি। আমার ধর্ম এটিই যে, কোন ব্যক্তি যত বেশি কল্যাণ, বরকত এবং আল্লাহ্র নৈকট্য পেতে চায় তা কেবল আঁ-হযরত (সা.)-এর সত্যিকার অনুসরণ এবং পূর্ণাঙ্গীন ভালবাসার মাধ্যমে পেতে পারে নতুবা নয়। তিনি (সা.) ছাড়া পুণ্যের কোন পথ নেই।

(লেকচার লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ২৬০)

চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে খোদা তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে এই অধমকে প্রেরণ করেন এবং সেই আসমানী অস্ত্র প্রদান করেন যার দ্বারা আমি ক্রুশ ধ্বংস করতে পারি।

"চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে ঠিক পথভ্রষ্টতা ও অরাজকতার যুগেই মানুষের সংশোধনের জন্য খোদা তা'লা এই অধমকে প্রেরণ করেছেন। যেহেতু এই যুগের অরাজকতা ইসলামের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিল, খৃষ্টান পাদ্রীদের অরাজকতা ছিল, এই কারণে খোদা তা'লা এই অধমের নাম রেখেছেন মসীহ মওউদ। এটি সেই নাম যা আমাদের নবী (সা.)কে জানানো হয়েছিল আর আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এক প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল যে, ত্রিত্ববাদের আধিপত্যের যুগে এই নামের একজন 'মুজাদ্দিদ' (সংস্কারক) আসবেন যার হাতে ক্রুশ ধ্বংস হওয়া অবধারিত। এই কারণেই সহী বুখারীতে এই মুজাদ্দিদের এই পরিভাষাই লিপিবদ্ধ রয়েছে। অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মাদিয়ায় তাদের এক ইমাম হবে যে ক্রুশ ধ্বংস করবে। এটি সেই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত ছিল যে তিনি ক্রুশীয় মতবাদের আধিপত্যের যুগে আসবেন। খোদা তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে এমনটিই করেন এবং এই অধমকে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে প্রেরণ করেন এবং সেই আসমানী অস্ত্র প্রদান করেন যার দ্বারা আমি ক্রুশ ধ্বংস করতে পারি।"

(কিতাবুল বারিয়া, রূহানী খাযায়েন, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ; ৩৫৮)

খোদার পক্ষ থেকে ধর্ম সংস্কারের নিমিত্তে যাঁর আগমণের কথা ছিল, আমিই সেই ব্যক্তি

খোদা তা'লা বর্তমান যুগের অবস্থা অবলোকন করে এবং পৃথিবীকে সর্ব প্রকারের দুষ্কর্ম, পাপাচার ও গোমরাহিতে পরিপূর্ণ দেখে আমাকে সত্য প্রচারার্থে ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে মনোনীত করেছেন। এ যুগেও এরূপ ছিল যে, পৃথিবীর মানুষ হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দী শেষ করে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে পৌঁছে গিয়েছিল। তখন আমি এই আদেশের অনুবর্তিতায় জনগণকে লিখিত বিজ্ঞাপন ও বক্তৃতার মাধ্যমে আহ্বান জানাতে থাকলাম, এই শতাব্দীর শিরোভাগে খোদার পক্ষ থেকে ধর্ম সংস্কারের নিমিত্তে যাঁর আগমণের কথা ছিল, আমিই সেই ব্যক্তি; যাতে ঐ ঈমান - যা পৃথিবী হতে উঠে গেছে তাকে আবার প্রতিষ্ঠিত করি এবং খোদার পক্ষ থেকে শক্তি লাভ করে তাঁরই কৃপার আকর্ষণে জগদ্বাসীকে পুণ্যকর্ম, খোদাভীতি ও ন্যায়-পরায়ণতার দিকে আকৃষ্ট করি এবং তাদের বিশ্বাসগত ও আমল সংক্রান্ত-ভ্রান্তিসমূহ দূরীভূত করি।

এরপর যখন কয়েক বৎসর অতিবাহিত হল তখন খোদা ওহীর মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে আমার কাছে প্রকাশ করলেন, ঐ মসীহ-যিনি আদি হতে এই উম্মতের জন্য প্রতিশ্রুত ছিলেন এবং ঐ শেষ মাহদী-যিনি ইসলামের পতনের যুগে এবং গোমরাহি বিস্তার লাভ করার যুগে সরাসরি খোদার কাছ থেকে হেদায়াত প্রাপ্ত হবেন এবং ঐ ঐশী খাদ্য-সম্ভার নবরূপে মানবজাতির কাছে উপস্থাপন করবেন, তিনি খোদার বিধান অনুযায়ী নিযুক্ত হয়েছেন। আজ হতে তেরশত বৎসর পূর্বে রসূল করীম (সা.) যাঁর শুভ সংবাদ প্রদান করেছেন, সেই ব্যক্তি আমিই। এই ব্যাপারে আল্লাহ্র বাক্যালাপ ও রহমান খোদার সম্ভাষণ এত সুস্পষ্টরূপে ও অজস্র ধারায় অবতীর্ণ হয়েছে যে, এতে সন্দেহ ও সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। প্রত্যেকটি ঐশী বাণী লৌহ-শলাকার ন্যায় আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হচ্ছিল এবং এ সকল ঐশী বাক্যালাপ এরূপ মহান ভবিষ্যদ্বাণীতে পরিপূর্ণ ছিল যে, এইগুলি দিবালোকের ন্যায় পূর্ণ হচ্ছিল। এর ধারাবাহিকতা, বিপুলতা ও অলৌকিক শক্তির নিদর্শন আমাকে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য করেছে, এই গুলি ঐ এক-অদ্বিতীয় খোদার কালাম, যাঁর কালাম কুরআন শরীফ। এখানে তওরাত ও ইঞ্জিলের নাম নিচ্ছি না। তওরাত ও ইঞ্জিল বিকৃতি সৃষ্টিকারীদের হাতে এতখানি বিকৃত হয়েছে, এখন এগুলিকে খোদার কালাম বলা যায় না। মোট কথা, খোদার ঐ ওহী-যা আমার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে, তা এরূপ প্রত্যয়পূর্ণ ও সুনিশ্চিত, এর মাধ্যমে আমি নিজ খোদাকে লাভ করেছি। এই ওহী না কেবলমাত্র ঐশী নিদর্শনের মাধ্যমে 'হাক্কুল ইয়াকিন' (ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালবদ্ধ নিশ্চিত বিশ্বাস) এর মর্যাদায় পৌঁছেছে বরং এর প্রতিটি অংশ যখন খোদা তা'লার কালাম কুরআন শরীফের সাথে যাচাই করে দেখা হল, তখন এটি কুরআন শরীফ অনুযায়ী সত্য বলে প্রমাণ হল এবং এর সত্যায়নের জন্য স্বর্গীয় নিদর্শন বারিধারার ন্যায় বর্ষিত হয়েছে।

যেভাবে একথা লিপিবদ্ধ ছিল , এই মাহদীর যুগে রমযান মাসে সূর্য ও চন্দ্র হবে, সেভাবে এই দিনগুলিতে রমযান মাসে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হয়েছে। যেমন কুরআন শরীফে লিপিবদ্ধ আছে এবং পূর্বের নবীগণও এই সংবাদ দিয়াছেন, এই দিনগুলিতে মহামারী ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হবে এবং এমন হবে যে, কোন গ্রাম ও শহর ঐ মহামারী হতে মুক্ত থাকবে না। সেবাবে পাঞ্জাবে এই সময় ব্যাপক আকারে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। বস্তুত এরূপই হয়েছে এবং হচ্ছে।

(তাযকেরাতুশ শাহাদাতাঈন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৮, পৃ: ৩,৪)

জুমআর খুতবা

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা এবং মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা এবং এই বিষয়ে জামাতের সদস্যদের প্রতি উপদেশবাণী।

যে আওয়াজ ছোট্ট একটি গ্রাম থেকে উত্থিত হয়েছিল তা আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পৃথিবীর ২১০টি দেশে বিস্তৃতি লাভ করেছে আর এটি তাঁর সত্যতার প্রমাণও বটে। বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল যেখানে ৩০/৪০ বছর পূর্বেও আহমদীয়াত পৌঁছার কোন ধারণাই ছিল না, সেখানে আজ কেবল আহমদীয়াতের বার্তাই পৌঁছে নি বরং সেখানে আল্লাহ তা'লা এমন সব দৃঢ় ঈমানের অধিকারী মানুষ সৃষ্টি করছেন যা দেখে বিস্মিত হতে হয়।

অতএব প্রত্যেক আহমদীর এবং আমাদের প্রত্যেকের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। আমরা যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে মেনে থাকি তাহলে এই মান্য করা ও বয়আতের সুবাদে আমাদের ওপর যে দায়িত্ব বর্তায় তা কি আমরা পালন করছি?

মসীহ মওউদ সংখ্যা উপলক্ষ্যে সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ২৩শে মার্চ, ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (২৩ আমান , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজকে ২৩ মার্চ। আমাদের জামা'তে মসীহ্ মওউদ দিবসের প্রেক্ষাপটে এ দিনটিকে স্মরণ করা হয়। মসীহ্ মওউদ দিবসের দৃষ্টিকোণ থেকে জামা'তগুলো জলসারও আয়োজন করে থাকে। আগামী দুই দিনে অর্থাৎ সপ্তাহান্তে শনি ও রবিবারে অনেক জামা'ত এ জলসার আয়োজন করবে আর তাতে এ দিনের ইতিহাস, পটভূমি সবকিছু বর্ণনা করা হবে।

এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ(আ.)-এর কতক উক্তি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব যাতে তিনি মসীহ্ মওউদের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা এবং তাঁর মর্যাদা সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। তাঁর দাবির পর নামসর্বস্ব মুসলমান আলেমরা জনসাধারণকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। যতটা নিচে নামা সম্ভব ছিল তারা নেমেছে আর এখনো তারা এটিই করছে। কিন্তু ঐশী সমর্থনে তাঁর জামা'ত উন্নতি করছে আর নেক প্রকৃতির মানুষ জামা'তভুক্ত হচ্ছে।

যাহোক হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁর আগমনের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আর এই ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন- আমিই আগমনকারী মসীহ্ মওউদ। তিনি বলেন- "সত্যিকার তওহীদ বা একত্ববাদ এবং রসূলে করীম(সা.)-এর সম্মান, সম্ভ্রম, সত্যতা এবং আল্লাহ্‌র কিতাব তথা কুরআন শরীফ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কিনা সে বিষয়ে অন্যায়ভাবে হামলা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'লার আত্মাভিমানের দাবি কি এটি হওয়া উচিত নয় যে তিনি সেই ক্রুশ ভঙ্গকারীকে নাযিল করেন? কেননা তখন মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তা এবং ইসলামের ওপর আক্রমণ খ্রিষ্টানদের পক্ষ থেকে হচ্ছিল। তিনি বলেন, আল্লাহ্ কি স্বীয় প্রতিশ্রুতি إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (সূরা আল হিজর: ১০) ভুলে গেছেন? নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য আর স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে তিনি পৃথিবীতে এক সতর্ককারী প্রেরণ করেছেন। জগদ্বাসী তাকে গ্রহণ করে নি কিন্তু খোদা তা'লা অবশ্যই তাকে গ্রহণ করবেন আর জোরালো আক্রমণের মাধ্যমে তাঁর সত্যতা প্রকাশ করবেন। তিনি বলেন, আমি সত্যি করে বলছি, আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমি মসীহ্ মওউদ হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর না হয় প্রত্যাখ্যান কর, কিন্তু তোমাদের প্রত্যাখ্যানে কিছুই হবে না, আল্লাহ যে সংকল্প করে রেখেছেন তা অবশ্যই পূর্ণ হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'লা পূর্বেই বারাহীনে আহমদীয়ায় বলে রেখেছেন যে, 'সাদাকাল্লাহু ওয়া রাসুলুহু ওয়া কানা ওয়াদাম্ মাফউলা' । (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০৬) অর্থাৎ আল্লাহ্‌ও তাঁর রসূলের কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে আর খোদার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে।

আরেক স্থানে তিনি বলেন, -" নবুয়্যতের মাপকাঠিতে এই জামা'তকে যাচাই কর এরপর দেখ সত্য কার সাথে। কাল্পনিক নীতি এবং কাল্পনিক প্রস্তাবনায় কিছু যায় আসে না আর কাল্পনিক কথার মাধ্যমে আমি নিজের দাবির সত্যায়নও করি না। আমি আমার দাবিকে নবুয়্যতের মাপকাঠিতে উপস্থাপন করি। তাহলে কোন কারণে একই মাপকাঠিতে এর সত্যতা যাচাই করা হবে না। আমার কথাগুলো যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে শুনবে, আমি নিশ্চিত যে, সে লাভবান হবে আর তা মেনে নিবে। কিন্তু যাদের হৃদয়ে কার্পণ্য ও বিদ্বেষ রয়েছে আমার কথায় তাদের কোন উপকারই হবে না। তাদের উপমা হলো ট্যারা ব্যক্তির ন্যায়। (যে ব্যক্তি ট্যারা হয়ে থাকে এবং একটি জিনিসকে দুটি দেখে) তাকে যতই যুক্তিপ্রমাণ দেওয়া হোক যে, জিনিস দুটি নয় বরং একটি, সে মানবে না। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, এমন ট্যারা দৃষ্টির এক ব্যক্তি কারো সেবক ছিল। মুনিব তাকে বললো, ভিতর থেকে আয়না নিয়ে আস। সে ভিতরে যায় আর ফিরে এসে বলে, ভিতরে দুটি আয়না রয়েছে কোনটি নিয়ে আসব? মুনিব বলে, দুটি নয় বরং একটিই আয়না আছে। সেই ট্যারা ব্যক্তি বলে, আমি কি তবে মিথ্যা বলছি? তার মনিব তাকে বলে, ঠিক আছে, তাহলে একটা ভেঙে ফেল। ভাঙার পর সে বুঝতে পারে যে, সত্যিকার অর্থে ভুল আমারই ছিল। তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান এসব ট্যারা দৃষ্টির মানুষকে আমি কী উত্তর দিব? বস্তুত আমরা দেখি, এরা বারংবার কোন কিছু যদি উপস্থাপন করে তবে তা হাদীসের স্তুপই হয়ে থাকে যাকে তারা নিজেরাই ধারণার ফসলের চেয়ে বড় কোন মর্যাদা দেয় না। তারা জানেনা যে, একটি সময় এমন আসবে যখন এদের উদ্ভট ও অর্থহীন কথাবার্তা নিয়ে মানুষ হাসিঠাট্টা করবে। (এরা যেসব আজেবাজে কথা বলে, তা নিয়ে মানুষ হাসিঠাট্টা করবে।) তিনি বলেন, প্রত্যেক সত্যান্বেষীর আমাদের কাছে আমাদের দাবির প্রমাণ চাওয়ার অধিকার রয়েছে। (এটি সঠিক কথা, দাবির প্রমাণ চাওয়া উচিত, এটি সবার অধিকার) এজন্য আমরা তা-ই উপস্থাপন করি যা নবীগণ উপস্থাপন করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, কুরআন, হাদীস ও যৌক্তিক প্রমাণাদি অর্থাৎ যুগের অবস্থা যা এক সংস্কারককে হাতছানি দিয়ে ডাকছে আর সেসব নিদর্শন যা আল্লাহ্ আমার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন আমি

সেগুলোর একটি চিত্র অঙ্কন করেছি যাতে প্রায় দেড়শত নিদর্শনের উল্লেখ করেছি। এক দৃষ্টিকোণ থেকে কোটি কোটি মানুষ এর সাক্ষী রয়েছে। বাজে কথা উপস্থাপন করা ভাগ্যবানের কাজ নয়। তিনি (আ.) বলেন, মহানবী (সা.) এ কারণেই বলেছেন, তিনি 'হাকাম' হয়ে আসবেন। (অর্থাৎ মসীহ্ মওউদ হাকাম বা ন্যায় বিচারক হিসেবে আসবেন) তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। (তিনি সিদ্ধান্তদাতা হবেন তার সিদ্ধান্ত মেনে নাও।) যাদের মনে অশুভ বুদ্ধি থাকে, তারা যেহেতু সত্য মানতে চায় না তাই তারা বাজে যুক্তি এবং আপত্তি উপস্থাপন করে থাকে। কিন্তু তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, পরিশেষে খোদা তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে জোরালো আক্রমণের মাধ্যমে আমার সত্যতা স্পষ্ট করবেন। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, আমি যদি কোন মিথ্যা দাবি করতাম তাহলে তিনি আমাকে অনতিবিলম্বে ধ্বংস করে দিতেন। কিন্তু আমার পুরো কার্যক্রম তাঁর নিজেরই আর আমি তাঁর পক্ষ থেকেই এসেছি। আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা তাঁকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করার নামান্তর। তাই তিনি নিজেই আমার সত্যতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবেন। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪-৩৫)

মসীহ্ মওউদকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করার ফলাফল তোমাদেরকে আল্লাহ্তা'লা ও রসূলের অমান্যকারী বানিয়ে দিবে- এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"আমাকে অস্বীকার করা আমাকে অস্বীকার করা নয় বরং এটি আল্লাহ্ও তাঁর রসূল (সা.) কে অস্বীকার করার সামিল। কেননা যে আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করে সে আমাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রত্যাখ্যান করার পূর্বে (আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ক্ষমা করুন) আল্লাহ্ তা'লাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করে। অথচ সে দেখছে যে, অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ নৈরাজ্য সীমা ছাড়িয়ে গেছে আর আল্লাহ্ তা'লা إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (সূরা আল হিজর : ১০)-এর প্রতিশ্রুতি প্রদান করা সত্ত্বেও তাদের সংশোধনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। অথচ বাহ্যতঃ সে এ কথার ওপর ঈমান রাখে যে, আয়াতে 'ইস্তেখলাফে' আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, মূসার উম্মতের ন্যায় এই মুহাম্মদী উম্মতের মাঝেও আল্লাহ তা'লা খলীফাদের ধারা সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। কিন্তু নাঊযুবিল্লাহ্ তিনি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি আর এখন এই উম্মতের কোন খলীফা নেই। কেবল এটিই নয় বরং এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, কুরআনে মহানবী (সা.) কে যে মূসার প্রতিচ্ছবি আখ্যা দেওয়া হয়েছে এটিও নাঊযুবিল্লাহ্ সঠিক নয় কেননা এই ধারার পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্যের জন্য এই চতুর্দশ শতাব্দীতে এই উম্মতের মধ্য থেকে এক মসীহ্র জন্মগ্রহণ করা আবশ্যক ছিল, যেভাবে মূসার উম্মত থেকে চতুর্দশ শতাব্দীতে এক মসীহ্ এসেছিলেন। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনের আয়াত وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ (সূরা আল জুমুআ: ০৪) -কেও মিথ্যা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করতে হবে যা এক আগমনকারী আহমদী বুরুজ বা প্রতিচ্ছবির সংবাদ প্রদান করে। আর এভাবে কুরআনের আরো অনেক আয়াত আছে যেগুলোকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। বরং আমি দাবির সাথে বলব যে, 'আলহামদ' থেকে আরম্ভ করে 'ওয়ান্নাস' পর্যন্ত পুরো কুরআন পরিত্যাগ করতে হবে। তাই চিন্তা করে দেখ, আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করা কি সামান্য কোন বিষয়? আমি নিজের পক্ষ থেকে বলছি না, খোদা তা'লার কসম খেয়ে বলছি যে, সত্য কথা হলো আমাকে যে পরিত্যাগ করবে এবং মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করবে, মৌখিকভাবে না করলেও কার্যত সে পুরো কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করল এবং খোদা তা'লাকে পত্যিাগ করল। আমার এক এলহামেও এর দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। (আল্লাহ্ তা'লা তাকে সম্বোধন করে বলেছেন) "اَنْتَ مِنِّیْ وَاَنَا مِنْكَ" । তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে আমাকে অস্বীকার করা খোদা তা'লাকে অস্বীকার করার সামিল আর আমাকে মান্য করলে আল্লাহ্তা'লাকে মান্য করা হয় এবং তাঁর সত্তায় দৃঢ় ঈমান জন্মে। আর আমাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রত্যাখ্যান করা আমাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রত্যাখ্যান করা নয় বরং এটি রসূলে করীম (সা.) কে অস্বীকার করার সামিল। এখন কেউ আমাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রত্যাখ্যানের সাহস দেখানোর পূর্বে মনে মনে একটু চিন্তা করুক এবং বিবেকের রায় নিয়ে দেখুক যে, সে আসলে কাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রত্যাখ্যান করছে?"

মসীহ্ মাওউদকে মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রত্যাখ্যান করলে রসূলে করীম (সা.) কে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়। এর কারণ কী? মসীহ্ মওউদকে অস্বীকার করলে কীভাবে তা মহানবী (সা.) কে মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রত্যাখ্যান বলে গণ্য হয়?- এ বিষয়টিকে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন-

"মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) কে কীভাবে অস্বীকার করা হয়? (অর্থাৎ মসীহ্ মওউদকে অস্বীকার করলে কেন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে অস্বীকার করা হয়?) তিনি বলেন, এটি এভাবে হয় যে, মহানবী (সা.) যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দেদ বা সংস্কারক আসবে তা নাঊযুবিল্লাহ্ মিথ্যা প্রমাণিত হবে। আর তিনি যে বলেছিলেন, 'ইমামুকুম মিনকুম' তাও নাঊযুবিল্লাহ্ ভুল প্রমাণিত হয়। এছাড়া খ্রিষ্টীয় নৈরাজ্যের যুগে তিনি যে এক মসীহ্ ও মাহদীর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন তাও নাঊযুবিল্লাহ্ ভুল প্রমাণিত হয়। কেননা নৈরাজ্য বিদ্যমান হওয়া সত্ত্বেও যে ইমামের আসার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তিনি আসেন নি। এখন এই কথাগুলো স্বীকার করলে কার্যত সে মহানবী (সা.) এর প্রত্যাখ্যানকারী সাব্যস্ত হবে কি না? তিনি বলেন, তাই পুনরায় আমি স্পষ্ট করে বলছি, আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করা এত সহজ বিষয় না। আমাকে কাফের আখ্যা দেওয়ার পূর্বে নিজেকে কাফের হতে হবে, আমাকে বিধর্মী ও পথভ্রষ্ট আখ্যা দেওয়ার পূর্বে নিজের ভ্রষ্টতা ও লাঞ্ছনা স্বীকার করে নিতে হবে। আমাকে কুরআন ও হাদীসের প্রত্যাখ্যানকারী বলার পূর্বে স্বয়ং নিজেকে কুরআন ও হাদীস প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আর এরপরও তারাই পরিত্যাগ করবে। অর্থাৎ আমি পরিত্যাগ করব না বরং যারা আমাকে প্রত্যাখ্যানকারী বলে তারাই পরিত্যাগ করবে। তিনি (আ.) বলেন, আমি কুরআন ও হাদীসের সত্যায়নকারী ও সত্যতার প্রমাণ। আমি পথভ্রষ্ট নই বরং মাহ্দী (পথ-প্রদর্শনকারী)। আমি কাফের নই বরং 'আনা আউয়ালুল মুমিনীন'- এর যথাযথ সত্যায়নস্থল। আমি যা কিছু বলি, খোদা আমার সামনে প্রকাশ করেছেন যে, এটি সত্য। খোদার সত্তায় যার বিশ্বাস আছে এবং কুরআন ও রসূলুল্লাহ (সা.) কে যে ব্যক্তি সত্য মনে করে তার জন্য এ প্রমাণই যথেষ্ট যে, সে যেন আমার মুখে শুনেই নীরবতা পালন করে। কিন্তু যে ধৃষ্ট এবং দুঃসাহসী তার কী চিকিৎসা করা যাবে? আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাকে বোঝাবেন। (তিনি এক আগত মেহমানকে এসব কথা বোঝাচ্ছিলেন।) তিনি (আ.) বলেন, আমার বিষয়ে তাড়াহুড়া করবেন না বরং সুস্থ মানসিকতা ও নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করুন।" (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪-১৬)

পুনরায় এক উপলক্ষ্যে তিনি বলেন-

"অতএব এদের হৃদয়ে যদি কার্পণ্য ও হঠকারিতা না থাকে তাহলে আমার কথা শোনা উচিত এবং আমার অনুসরণ করা উচিত। এরপর দেখুক- খোদা তাদেরকে অন্ধকারে পরিত্যাগ করেন নাকি আলোর দিকে নিয়ে যান? আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে যে আমার দিকে আসবে তাকে ধ্বংস করা হবে না, বরং সে সেই জীবনের অংশীদার হবে যা অমর। (অর্থাৎ এ পৃথিবীতেও সম্মান লাভ করবে আর পরকালেও খোদা তা'লা তাকে পুরস্কারে ভূষিত করবেন।) তিনি (আ.)

আল্লাহ্র বাণী

তুমি শুধু সেই ব্যক্তিকে সতর্ক করিতে পার যে উপদেশের অনুসরণ করে এবং অদৃশ্যেও রহমান আল্লাহকে ভয় করিয়া চলে। (আন নাহল: ৬৯)

দোয়াপ্রার্থী: বেগম আয়েশা খাতুন, জামাতআহমদীয়া হরহরি, মুর্শিদাবাদ

আল্লাহ্র বাণী

'এবং এমন কোন বস্তু নাই যাহার অফুরন্ত ভাণ্ডার সমূহ আমাদের নিকট নাই এবং আমরা কেবল নিরূপিত পরিমাণ ব্যাতিরেকে উহা অবতীর্ণ করি না। (সূরা হিজর:আয়াত- ২২)

দোয়াপ্রার্থী: গোলাম মোস্তাফা, জেলা আমীর, মুর্শিদাবাদ, (প:ব:)

বলেন, "যার হৃদয় স্বচ্ছ এবং যার মাঝে তাকওয়াও আছে তার সামনে দ্বিতীয়বার আগমন সম্পর্কে হযরত ঈসা (আ.)-এর সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করছি। সে আমাকে বোঝাক যে, (ঈসা আসার পূর্বে এলিয়ার আগমণ আবশ্যক) ইহুদিদের প্রশ্নের উত্তরে ঈসা (আ.) যা বলেছেন তা সঠিক কিনা? ইহুদিরা নিজেদের ধর্মীয় গ্রন্থ উপস্থাপন করে বলতো, মালাকী নবীর গ্রন্থে এলিয়া নবীর আসার কথা লিপিবদ্ধ আছে, এলিয়ার মসীল বা প্রতিচ্ছবির উল্লেখ নেই। (স্বয়ং এলিয়ার আসার কথা আছে মসীলের উল্লেখ নেই, তার ভাবাদর্শের কারো আসার কথা কোথাও উল্লেখ নেই।) তিনি (আ.) বলেন, ঈসা (আ.) বলেছেন– এই ইহোনাই হল আগমনকারী ব্যক্তি, ইচ্ছা হলে গ্রহণ কর। এখন কোন বিচারকের কাছে বিচারের ভার দাও আর দেখ যে, সে কার পক্ষে ডিক্রি বা রায় দেয়? (বাহ্যিক বিষয়ের ভিত্তিতে যদি সিদ্ধান্ত করাতে হয় তবে কোন বিচারকের সামনে বিষয়টি উপস্থাপন করে দেখ যে, কার পক্ষে ডিক্রি দেয়।) নিশ্চয়ই সে ইহুদিদের পক্ষে সিদ্ধান্ত দিবে, (কেননা আক্ষরিকভাবে যা লেখা আছে সে অনুসারেই সিদ্ধান্ত হবে।) তিনি বলেন, কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সঠিক নয় কেননা একজন মু'মিন, যে আল্লাহতে বিশ্বাস রাখে আর জানে যে, খোদার প্রেরিতরা কীভাবে আসেন, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে, ঈসা (আ.) যা কিছু বলেছেন এবং করেছেন সেটিই সত্য ও সঠিক। এখনো সেই একই বিষয় নাকি ভিন্ন কিছু? যদি খোদাভীতি থাকে তাহলে 'এ দাবি মিথ্যা'– এ কথা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে গিয়ে শরীর কেঁপে উঠার কথা। পরিতাপ এবং আক্ষেপের বিষয় হলো, এদের মাঝে এতটাও ঈমান নেই, যতটা সে ব্যক্তির ছিল যে ফেরাউনের জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল আর সে বলেছিল, এ ব্যক্তি যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে, আমার বিষয়ে যদি তাকওয়ার ভিত্তিতে কাজ নেওয়া হতো তাহলে কেবল এতটাই বলে দিত আর দেখত যে, খোদা তা'লা কি আমাকে সাহায্য করছেন নাকি আমার জামা'তকে ধ্বংস করছেন? (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০-৩১)

যে আওয়াজ ছোট্ট একটি গ্রাম থেকে উত্থিত হয়েছিল তা আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পৃথিবীর ২১০টি দেশে বিস্তৃতি লাভ করেছে আর এটি তাঁর সত্যতার প্রমাণও বটে। দূরদূরান্তের বিভিন্ন অঞ্চল যেখানে ৩০/৪০ বছর পূর্বেও আহমদীয়াত পৌঁছার কোন ধারণাই ছিল না, সেখানে আজ কেবল আহমদীয়াতের বার্তাই পৌঁছে নি বরং সেখানে আল্লাহ তা'লা এমন সব দৃঢ় ঈমানের অধিকারী মানুষ সৃষ্টি করছেন যা দেখে বিস্মিত হতে হয়। এখানে একটি ঘটনাও বর্ণনা করছি।

বেনিন আফ্রিকার ছোট্ট একটি দেশ। সেখানে ২০১২ সনে একটি জামা'ত গঠিত হয়। গ্রামের এক ভদ্রলোক আহমদীয়াত গ্রহণ করেন, তার নাম ইব্রাহীম সাহেব। ইতিপূর্বে তিনি মুসলমান ছিলেন আর যথেষ্ট জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পর তিনি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠায় উত্তরোত্তর উন্নতি করেন। আত্মীয়স্বজন এবং ভাইদের তবলীগ করা আরম্ভ করেন। তার ভাই তার তবলীগে বিরক্ত হয়ে বলেন, সে আমাদেরকে তবলীগ করে আমাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করছে। সে তার সাথে সে ঝগড়াবিবাদ আরম্ভ করে, কিন্তু তিনি তার তবলীগ অব্যাহত রাখেন। মানুষকে আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের বাণী পৌঁছাতে থাকেন। এভাবে তার প্রচেষ্টায় আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আশপাশের তিনটি গ্রাম আহমদীয়াতভুক্ত হয়। ইব্রাহিম সাহেবের এক ভাই তার এক বন্ধুর যোগসাজশে তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। সে যেহেতু আহমদীয়াতের প্রসার ঘটিয়ে চলেছে তাই একমাত্র প্রতিকার হলো তাকে হত্যা করা। ইব্রাহিম সাহেব বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি। তার বড় ভাই এবং তার বন্ধু একটি গর্ত করে তাতে কিছু নিক্ষেপ করছে। তিনি বলেন, এ স্বপ্নের তিন দিন পরেই তার বড় ভাইয়ের বন্ধু হঠাৎ করে অসুস্থ হয় এবং মারা যায়। এর প্রেক্ষিতে সে বলা আরম্ভ করে যে, আমার ভাই আহমদী, সে আমার বন্ধুকে কোন যাদুটোনা করেছে। তিনি বলেন, কয়েক দিন পর আমি আবার স্বপ্নে দেখি, আমার ভাই এক গাছের সাথে দাঁড়িয়ে নিজেকে মাপছে। সে এলাকার রীতি হলো যখন কেউ মারা যায় তখন তার কবর খোড়ার জন্য এক বৃক্ষের বাকল দ্বারা লাশের মাপ নেয় হয় যেন সেই আকার অনুসারে কবর প্রস্তুত করা যায়। তিনি বলেন, কিছু দিন পর বড় ভাইয়ের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী অসুস্থ হয় আর দুই দিনের মধ্যেই মারা যায়। এরপর সন্তানরা অসুস্থ হওয়া আরম্ভ হয়। তার মধ্যে কোন পরিবর্তন হচ্ছিল না। তার ভাই গুজব ছড়াতে থাকে যে, এই ব্যক্তি যাদুটোনা করে। আর স্থানীয় চীফ বা বাদশাহ্র কাছে সে অভিযোগ করে এবং সাহায্য চায়। সে বলে কিছু অর্থ নিয়ে এস, আমি তার চিকিৎসা করছি। যাহোক তার ভাই টাকা প্রদান করে। বাদশাহ্ ইব্রাহিম সাহেবকে ডেকে পাঠায় আর তিনি তার কাছে গেলে সে অত্যন্ত ক্রোধের সাথে বলে, তুমি কি তামাশা বানিয়ে রেখেছো, নতুন ধর্ম অবলম্বন করেছ, নতুন ধর্মের সূচনা করেছ, এই মূহুর্তে এটি পরিত্যাগ কর আর তওবা কর, অন্যথায় তুমি আগামীকালের সূর্য দেখবে না। তোমার জীবনে আগামীকাল আসবে না। ইব্রাহিম সাহেব বলেন, আমি সত্য মনে করেই ধর্ম গ্রহণ করেছি, তাই এটি আমি পরিত্যাগ করতে পারি না। বাকি থাকল মৃত্যুর কথা, জীবন ও মৃত্যু তো আল্লাহ্র হাতে। এ কথা শুনে বাদশাহ্ বলে, এই এলাকার খোদা আমি, আমি যা চাই করি। আর তুমি ভালোভাবে জান যে, আমি কী সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি। আমি যার সম্পর্কে বলে দিই, সে কাল পর্যন্ত মারা যাবে সে অবশ্যই মারা যায়। ইব্রাহিম সাহেব বলেন, ঠিক আছে তুমি অন্য লোকদের হয়তো এমনটি বলে থাকবে কিন্তু এ জন্য তোমাকে আমার কিছুই বলার নেই। আমি আহমদীয়াত ছাড়ব না, কেননা এটিই হলো প্রকৃত ও সত্য ইসলাম। চীফ তখন আরো ক্ষেপে যায়, সে তার লোকদেরকে বলে, একে নিয়ে কামরায় আটকে রাখ। তারা তাকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন ইব্রাহিম সাহেব তাদেরকে বলেন, তোমরা আমার বিষয়ে নাক গলাবে না। এ বিষয়টি পরিত্যাগ কর। আমাকে আটক না করে ছেড়ে দাও, আমাকে যেতে দাও। যাহোক তারাও লোভী হয়ে থাকে, কিছু অর্থ নিয়ে তারা তাকে ছেড়ে দেয়। সেই চীফ বা বাদশাহ্ তার জীবনাবসান ঘটাবে এমন কি সাধ্য তার। পরের দিনই সংবাদ আসে যে সেই বাদশাহ্পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছে এবং নড়াচড়া করার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে। দুদিন পরেই সে মারা যায়। এসব কিছু দেখে তার বড় ভাই, যে তার বিরোধী ছিল, সে তার বংশের লোকদের বলে, আমাদের মাঝে মীমাংসা করিয়ে দিন। তিনি বলেন, আমার কারো সাথে কোন ঝগড়া ছিল না, আমি এমনিতেই শান্তিপ্রিয় আর ইসলামের বার্তাও এটিই। চীফের মারা যাওয়ার এই নিদর্শন দেখে উক্ত অঞ্চলে বিরাট প্রভাব পড়ে এবং এ বিষয় নিয়ে অনেক হইচই হয় আর আহমদীয়াতের সত্যতা প্রমাণিত হয়। অতএব আজও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমর্থনে এমন বিষয় প্রমাণিত হচ্ছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"দেখ! আমি আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলছি, সহস্র সহস্র নিদর্শন আমার সত্যতার প্রমাণস্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে আর ভবিষ্যতেও হবে। (এটি যে, তা বন্ধ হয়ে গেছে তা নয়।) তিনি বলেন, ভবিষ্যতেও হবে। এটি যদি মানবীয় পরিকল্পনা হতো তাহলে এর এতটা সাহায্য ও সমর্থন কখনই করা হতো না। (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা: ৪৮) এটি আল্লাহ্ তা'লারই পরিকল্পনা, যে কারণে সাহায্য ও সমর্থন করা হচ্ছে।

একস্থানে সংস্কারক ও মসীহ্ মওউদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"যেভাবে প্রত্যেক ফসলের একটি কর্তনের সময় থাকে, একইভাবে এখন নৈরাজ্য দূর করার সময় এসে গেছে। (পৃথিবীতে যে নৈরাজ্য ও পাপ ছড়িয়ে আছে তা দূর করার সময় এসে গেছে।) তিনি বলেন, সত্যবাদীর চরম অসম্মান ও অবহেলা করা হয়েছে। আর মহানবী (সা.)-এর সম্মান নাউযুবিল্লাহ্ মাছি ও ভীমরুলের সমানও করা হয় নি। মানুষ ভীমরুলকেও ভয় করে আর পিঁপড়ার কারণেও শঙ্কায় থাকে, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.) সম্পর্কে বাজে কথা বলতে গিয়ে কেউ কোন দ্বিধা করে না। 'কায্যাবু বে আয়াতেনা' তাদের ক্ষেত্রে সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। তাদের

যুগ ইমামের বাণী

আধ্যাত্মিক জীবন পাওয়া যায় একমাত্র আমাদের নবী (সা.)-এর কল্যাণময় অস্তিত্বের মধ্যে। (তিরইয়াকুল কুলুব, পৃ: ১০)

দোয়াপ্রার্থী:

আনোয়ার আলি, জামাত আহমদীয়া অভয়পুরী (আসাম)

মুখ যতটা খোলা সম্ভব ছিল তারা তা খুলেছে এবং চিৎকার করে করে গালিগালাজ করেছে। এখন সত্যিই খোদা তা'লার তাদেরকে প্রতিহত করার সময় এসে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে সব সময়ই তিনি এমন এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেন যিনি তাঁর মাহাত্ম্য ও প্রতাপের জন্য গভীর আত্মাভিমান রাখেন। এমন ব্যক্তির সাথে অদৃশ্য হাতের সাহায্য ও সমর্থন থাকে। সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ তা'লাই সব কিছু করেন, কিন্তু এক সুন্নতের পূর্ণতাস্বরূপ তাকে সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۔" (সূরা আল ফাতাহ্ : ২৪) এখন সেই সময় এসে গেছে যখন আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় রীতি অনুসারে আমাকে পাঠিয়েছেন।

তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃতির নিয়মের প্রতি দৃষ্টি দিলে বোঝা যায়, কোন বিষয় যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন আকাশে এর প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। এটিই এর নিদর্শন যে, প্রস্তুতির সময় এসে গেছে। সত্য নবী, রসূল ও মুজাদ্দেদের বড় একটি লক্ষণ হলো, তার সময় মত আসা এবং প্রয়োজনের সময় আসা। মানুষ কসম খেয়ে বলুক, এখন কি আকাশে প্রস্তুতি নেওয়ার সময় হয় নি? (তিনি (আ.) মানুষকে প্রশ্ন করছেন যে, বল কসম খেয়ে বল, এটি কি সেই সময় নয়? সেই যুগও এমন ছিল আর আজও মানুষ এ কথাই বলছে যে, আমাদের কোন সংস্কারকের প্রয়োজন। বরং পাকিস্তানে তো স্বয়ং মৌলবীরাই এমন কথা বলে কিন্তু মসীহ্ মওউদকে তারা অস্বীকার করে।) তিনি (আ.) বলেন, স্মরণ রেখো! আল্লাহ্ তা'লা নিজেই সব কিছু করেন। আমরা এবং আমাদের জামা'তের সবাই যদি ঘরে বসে যাই তবুও কাজ হবে আর দাজ্জালের পতন অবশ্যই ঘটবে। "تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۔" (সূরা আলে ইমরান : ১৪১) (অর্থাৎ এভাবে যুগের পালা বদল হয়ে থাকে।) তিনি (আ.) বলেন, এর (দাজ্জালের) শিখরে অবস্থান বলে দিচ্ছে যে, তার পতন সন্নিকটে। (কোন কিছু যখন চরম মার্গে পৌঁছে যায় এবং চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায় আর সে যখন মনে করে, এখন আমি সর্ব শক্তির অধিকারী হয়ে গেছি আর সকল উন্নতি আমার হাতের মুঠোয় এসে গেছে তখন সেই চরম মার্গ থেকেই তার পতন আরম্ভ হয়ে যায়। একইভাবে এসব অপশক্তিরও পতন আরম্ভ হয়েছে। তা হোক ইসলাম বিরোধী শক্তি বা এমন মানুষ যারা আহমদীয়াত ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরোধী।) তিনি বলেন, এর উচ্চতা বা উন্নতি থেকে প্রতীয়মান যে, এখন সে অবনতি বা অধঃপতন দেখবে। (অর্থাৎ সে চরম উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। এখন এটি প্রকাশ করছে যে, এখন তার পতন ঘটবে।) তার বিস্তার লাভ তার ধ্বংস হওয়ার চিহ্ন। (সে তার শক্তি ও বিস্তৃতিকে অনেক বড় মনে করে। অতএব এটি এখন তার ধ্বংসের লক্ষণ হয়ে যাবে।) হ্যাঁ! সুশীতল বাতাস প্রবাহিত হওয়া আরম্ভ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কাজ ধীর গতিতে হয়। (লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া আরম্ভ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাজ ধীর গতিতে হয় আর তা ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যই হবে।) তিনি বলেন, আমাদের কাছে অন্য কোন প্রমাণ না থাকলেও যুগের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে মুসলমানদের জন্য আবশ্যক ছিল, তারা যেন পাগলপারা হয়ে সন্ধান করে যে, মসীহ্ কেন এখনো ক্রুশ ভঙ্গ করার জন্য এলেন না। তাকে নিজেদের ঝগড়ার জন্য ডাকা তাদের উচিত ছিল না। (ইসলামের জন্য আত্মাভিমান থাকলে তারা ইসলামের সুরক্ষার জন্য ডাকত এবং মসীহ্‌র সন্ধান করত, নিজেদের ঝগড়াবিবাদের মীমাংসার জন্য নয়।) তিনি (আ.) বলেন, কেননা তার কাজ হলো ক্রুশভঙ্গ করা আর যুগ এরই মুখাপেক্ষী। "

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯৬-৩৯৮)

একইভাবে আরেক জায়গায় তিনি বলেন,

" নাস্তিকতাও অনেক বেশি বিস্তার লাভ করছে আর এটিকে প্রতিহত করার জন্যও আমি এসেছি।" (মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮)

তিনি বলেন, এ জন্যই তার নাম মসীহ্ মওউদ। মানবজাতির কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রতি যদি মোল্লাদের দৃষ্টি থাকত তাহলে তারা আদৌ এমনটি করত না যেমনটি আমাদের সাথে করছে। তাদের ভাবা উচিত ছিল যে, আমাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করে তাদের কী লাভ হয়েছে? আল্লাহ্ তা'লা যার সম্পর্কে বলেন, হয়ে যাও, তার সম্পর্কে কে বলতে পারে যে, হয়ো না? (এদের ফতোয়া লেখার কারণে তাদের কী লাভ হয়েছে? জামা'ত সেভাবেই উন্নতি করে চলেছে। কেননা আল্লাহ্ তা'লা যখন সিদ্ধান্ত করেন যে, হয়ে যাও, তা হয়ে যায়। কেউ এতে বাধ সাধতে পারে না।)

তিনি বলেন, "যারা আমাদের বিরোধী তারাও আমাদের চাকর-বাকর আর কোন না কোনভাবে আমাদের কথা পূর্ব ও পশ্চিম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯৮)

যারা বিরোধিতা করছে তারাও আসলে বিরোধিতার মাধ্যমে আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের বাণী প্রচার করছে। কেননা এভাবেও মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অনেকেই চিঠি লিখে এবং যোগাযোগ করে বলে যে, অমুক মৌলবীর বিরোধিতার কারণে বা অমুক স্থানে আপনাদের বিরুদ্ধে কথা হচ্ছিল, এজন্য আমাদের ভিতরে আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়, আমরা গবেষণা আরম্ভ করি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে জামা'তী বইপুস্তকও সর্বত্রই এখন নাগালের ভিতর রয়েছে। অন্যান্য বিষয়ও পাওয়া যায় আর তুলনাও করা যায়। গবেষণা করার পর এখন আমরা জামা'তভুক্ত হতে চাই। অতএব মৌলবীদের বিরোধিতার এ মাধ্যমও এখন তবলীগের কারণ হচ্ছে।

কতকের আপত্তি হলো আমরা তো ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করছি এবং পূর্ব থেকেই যেখানে এত দল ও উপদল রয়েছে সেখানে নতুন একটি জামা'ত বা ফির্কা গঠনের কী প্রয়োজন ছিল আর আপনার জামা'তে যুক্ত হওয়ারই বা কী প্রয়োজন? তিনি (আ.) বলেন, অনেক সময় আমাদের আহমদীরাও আপত্তিকারীদের এসব কথা শুনে নীরব হয়ে যায়। সে যুগেও ছিল আর আজও এমন আছে যারা নীরব হয়ে যায়। কী উত্তর দিবে তা খুঁজে পায় না।

এমন লোকদের এই আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "অনেক লোক এমন আছে যারা এই আপত্তি করে যে, এই জামা'তের কী প্রয়োজন, আমরা কি নামায, রোযা করি না? এরা আসলে মানুষকে এভাবে বিভ্রান্ত করে আর এটি তেমন কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, অনবহিত বা অজ্ঞ কিছু লোক এমন কথা শুনে বিভ্রান্ত হবে এবং তাদের সুরে সুর মিলিয়ে বলবে, আমরা যেখানে নামায পড়ি, রোযা রাখি, হজ্জ করি, ওজিফা পড়ি সেখানে এই নতুন বিশৃঙ্খলার প্রয়োজন কি ছিল? (নতুন ফির্কা বানিয়ে কেন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হলো? আমরা যেহেতু নামায, রোযা করছি,তাই তোমাদের জামা'তভু ক্ত হওয়ার দরকার কী, আর একটি নতুন ফেতনা ও নৈরাজ্যের কি প্রয়োজন?) তিনি বলেন, স্মরণ রেখো! এমন কথা বোধশক্তি এবং তত্ত্বজ্ঞান না থাকার কারণে বলা হয়। এটি আমার কাজ নয়। এই বিশৃঙ্খলা (যা তাদের দৃষ্টিতে বিশৃঙ্খলা) যদি কেউ সৃষ্টি করে থাকে তবে তিনি হলেন আল্লাহ্ তা'লা যিনি এই জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। (আমি এই জামা'ত প্রতিষ্ঠা করি নি বরং আল্লাহ্ তা'লা এটি প্রতিষ্ঠা করেছেন।) কেননা ঈমানী অবস্থা দুর্বল হতে হতে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ঈমানী শক্তি সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে গেছে আর আল্লাহ্ তা'লা এই জামা'তের মাধ্যমে সত্যিকার ঈমানের চেতনা সঞ্চারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এরূপ অবস্থায় তাদের আপত্তি করা বৃথা ও অনর্থক কাজ। তাই স্মরণ রেখো! কারো হৃদয়ে এমন কুমন্ত্রণার উদ্রেক হওয়া কোনক্রমেই উচিত নয়। যদি গভীরভাবে চিন্তা ও প্রণিধান করা হয় তাহলে এরূপ কুমন্ত্রণা হৃদয়ে দানা বাঁধতেই পারে না। গভীরভাবে চিন্তা না করার ফলেই কুমন্ত্রণা হৃদয়ে দানা বাঁধে, যার কারণে বাহ্যিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেই তারা বলে দেয় যে, আরো অনেক মুসলমান রয়েছে। এমন কুমন্ত্রণার ফলে মানুষ অচিরেই ধ্বংস হয়ে যায়। তিনি বলেন, আমি এমন লোকদের কতক পত্র দেখেছি, যারা বাহ্যতঃ আমাদের জামা'তে বয়আত করেছে অথচ তারা বলে, আমাদেরকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে, অন্য মুসলমানরাও বাহ্যতঃ নামায পড়ে, কলেমা পাঠ করে, রোযা রাখে, নেক কাজ করে এবং পুণ্যবান মনে হয়, তাহলে নতুন এই জামা'তের কী প্রয়োজন? এসব মানুষ আমাদের বয়আতভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এমন আপত্তি শুনে লিখে, আমরা এর উত্তর দিতে পারি নি। এ ধরনের পত্র পড়ে এমন লোকদের জন্য আমার আক্ষেপ ও করুণা হয়, কেননা তারা আমার আগমনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই বোঝে নি। তারা শুধু দেখে যে, গতানুগতিকভাবে

এরা আমাদের মতই বিভিন্ন ইসলামী বিধিনিষেধ মেনে চলে আর খোদার নির্ধারিত আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করে অথচ তাতে সত্যের বোধন থাকে না। (শুধু বাহ্যিক ও কৃত্রিমভাবে নয় বরং সত্যিকার অর্থে ইবাদত হওয়া উচিত এবং অন্য সব আবশ্যকীয় দায়িত্বও পালিত হওয়া উচিত।) তাই এ সব কথা ও কুমন্ত্রণা জাদুর মত কাজ করে। (অর্থাৎএরূপ কুমন্ত্রণা হৃদয়ে দানা বাঁধে আর যেসব কথা এরা বলে এর প্রভাব তাদের ওপর জাদুর মত পড়ে।) সেই মুহূর্তে তারা চিন্তা করে না যে, আমার উদ্দেশ্য হল সত্যিকার ঈমান সৃষ্টি করা যা মানুষকে পাপের মৃত্যু থেকে রক্ষা করে। প্রথা ও অভ্যাসের দাসদের মধ্যে সে বিষয় নেই এবং তাদের দৃষ্টি সারবত্তার প্রতি নয় বরং বাহ্যিকতার প্রতি থাকে, আর তাদের হাতে কেবল খোসা রয়েছে যার মাঝে কোন শাঁস নেই।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩৭-২৩৯, প্রকাশকাল ১৯৮৫, লন্ডনে মুদ্রিত)

অতএব মুসলমানরা বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান পালন করে ঠিকই কিন্তু তাতে কোন প্রাণ নেই, তাকওয়া নেই।

তিনি বলেন, যারা নিজেকে মুসলমান দাবি করে তাদের কর্ম যদি নেক হতো তাহলে সেগুলোর পবিত্র ফলাফল কেন প্রকাশ পায় না?

তিনি (আ.) বলেন, এরা (অর্থাৎ কতক মুসলমান) বুঝে না যে, আমাদের মাঝে কোন বিষয়টি ইসলাম পরিপন্থি? (অ-আহমদী মুসলমানরা বলে) আমরা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' কলেমা পড়ি, নামায পড়ি, রোযার দিনগুলোতে রোযা রাখি, যাকাতও দিই [অর্থাৎ সব কাজই আমরা ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী করছি, এমন কোন বিষয় নেই যার জন্য তোমাদের সাথে যোগ দিলে ইসলামের মূলতত্ত্ব ভালোভাবে বুঝতে পারব কেননা আমরা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ি, নামায পড়ি, রোযা রাখি আর যাকাতও দিই। তিনি (আ.) বলেন, এগুলো সবই অর্থহীন।] কিন্তু আমি বলছি যে, এদের সকল কর্ম সৎকর্ম নয় বরং সেগুলো শুধু খোসার ন্যায় যার ভিতর কোন মগজ বা শাঁস নেই। এগুলো যদি সৎকর্ম হতো তাহলে এর পবিত্র ফলাফল কেন প্রকাশ পায় না? সৎকর্ম হিসেবে এগুলো তখন গণ্য হতে পারে যখন সেগুলো সকল প্রকার ত্রুটি ও সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত হবে, কিন্তু তাদের মাঝে এমন বিষয় কোথায়? আমি এটি বিশ্বাস করতে পারি না যে, এক ব্যক্তি মু'মিন ও মুত্তাকী হবে, পুণ্যবান হবে আবার সে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির শত্রুও হবে। এরা আমাকে লাগামহীন ও নাস্তিক আখ্যা দেয় আর আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করে না। আমি খোদার কসম খেয়ে বর্ণনা করেছি যে, আল্লাহ্তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করে পাঠিয়েছেন। তাদের হৃদয়ে যদি খোদা তা'লার কিছুটা মাহাত্ম্য এবং সম্মানও থাকত তাহলে তারা অস্বীকার করতে পারতো না। আর তারা ভয় করত যে, কোথাও আমরা খোদা তা'লার নামের অসম্মানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি না তো? কিন্তু এটি তখন সম্ভব যদি তাদের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় প্রকৃত ও আসল ঈমান থাকত এবং পরকালকে তারা ভয় করত আর 'লা তাক্ফু মা লাইসা লাকা বিহি ইলম'- (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৭)- আয়াত অনুসরণ" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪৩, প্রকাশকা-১৯৮৫, লন্ডনে মুদ্রিত) অর্থাৎ সেই কথা বলো না, যার জ্ঞান তোমাদের নেই।

মসীহ মওউদের আগমনের উদ্দেশ্য হলো অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত নৈরাজ্য ও আক্রমণ থেকে ইসলামকে রক্ষা করা এবং মহানবী (সা.)ও এ বিষয়েরই সংবাদ দিয়েছেন-এ কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"মহানবী (সা.) শেষ যুগ সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তখন দুই ধরনের নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিবে। একটি হলো অভ্যন্তরীণ অপরটি বহিস্থ। অভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য হলো, মুসলমানরা সত্যিকার হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে না, অপকর্মের ছত্রছায়ায় থাকবে, (তাদের মাঝে কোন নেককর্ম থাকবে না।) জুয়া, ব্যভিচার, মদপান এবং সকল প্রকারের পাপ ও কদাচারে লিপ্ত হয়ে আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করবে আর আল্লাহ্ তা'লার নিষেধাজ্ঞাকে অগ্রাহ্য করবে। নামায, রোযা পরিত্যাগ করবে এবং খোদার আদেশ-নিষেধের অসম্মান করা হবে। কুরআনের বিধিনিষেধ নিয়ে হাসিঠাট্টা করা হবে। (এগুলো হলো অভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য অর্থাৎ মুসলমানদের ব্যবহারিক অবস্থার বিকৃতি ঘটেছে, আর বেশিরভাগ মুসলমানের অবস্থা আজ এমনই। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের প্রতি দেখুন! পরস্পরের উপর কীভাবে অন্যায় করছে?) আর বহিস্থ নৈরাজ্য হলো, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হবে। (এটিও আজকাল অনেক বেশি হচ্ছে।) আর সকল প্রকার মর্মপীড়াদায়ক আক্রমণের মাধ্যমে ইসলামের অসম্মান ও ইসলামকে ধ্বংসের অপচেষ্টা করা হবে। ঈসার প্রভুত্ব মানানোর জন্য এবং তার ক্রুশীয় অভিশাপের প্রতি ঈমান সৃষ্টির জন্য সকল প্রকার অপকৌশল ও ষড়যন্ত্র করা হবে। বস্তুত অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ, এই উভয় ভয়াবহ নৈরাজ্যের সংশোধনের জন্য মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমেই এই সুসংবাদ লাভ হয়েছে যে, তাঁর উম্মতের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করা হবে যিনি বহিস্থ ফেতনা ও ক্রুশীয় ধর্মের ভিত্তিকে সমূলে উৎপাটন করবেন আর এ দৃষ্টিকোণ থেকেই তার নাম মসীহ্ ইবনে মরিয়ম হবে। আর অভ্যন্তরীণ দলাদলি ও বিভ্রান্তি দূরীভূত করে হেদায়াতের সঠিক পথ প্রতিষ্ঠা করবেন, এ কারণেই তিনি মাহদী আখ্যায়িত হবেন। আর وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ (সূরা আল জুমুআ : ৪)-আয়াতে এই সুসংবাদের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৪৪-৪৪৫)

অতএব আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছি, আমাদের খোদার সাথে সুসম্পর্ক এবং তাকওয়ার মান অন্যদের চেয়ে উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মোটের উপর তিনি যে চিত্র অঙ্কন করেছেন সেই চিত্র আমাদের হওয়া কাম্য নয়। আমাদের ব্যবহারিক অবস্থা অন্যদের চেয়ে ভালো হওয়া উচিত। আমাদের কর্ম সব সময় খোদার সন্তুষ্টিসম্মত এবং সৎকর্ম হওয়া উচিত। এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"বয়আত করার পর মানুষের কেবল এটি মান্য করা নেওয়া উচিত নয় যে, জামা'ত সত্য, (সত্য গ্রহণ করেছি এটিই যথেষ্ট) আর এটি মানলেই সে কল্যাণমণ্ডিত হয়। শুধু মানলেই আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হন না যতক্ষণ কর্ম ভালো না হবে। যেহেতু এই জামা'তভুক্ত হয়ে গেছ, অতএব নেক হওয়ার চেষ্টা কর, মুত্তাকী হও, সকল পাপ এড়িয়ে চল, এই সময় দোয়ার মাধ্যমে অতিবাহিত কর, দিবারাত্র বিগলিতচিত্তে দোয়ায় রত থাক, পরীক্ষার সময় খোদার ক্রোধও প্রবল থাকে। এমন সময় দোয়া, বিগলিত ক্রন্দন, সদকা ও খয়রাত দাও, নম্র ভাষায় কথা বল, ইস্তেগফারকে নিজের রীতিতে পরিণত কর, নামাযে দোয়া কর। প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, মিনতি করতে গিয়ে কেউ মারা যায় না। শুধু মান্য করাই মানুষের উপকারে আসে না। মানুষ যদি মান্য করার পর সেটিকে অবজ্ঞা করে তাহলে এতে তার কোন লাভ হয় না। অতএব, বয়আত করে লাভ হয় নি- এমন অভিযোগ করা অর্থহীন। আল্লাহ তা'লা শুধু কথায় সন্তুষ্ট হন না।"

পুণ্যকর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অর্থাৎ নেককর্ম কী- এর বর্ণনায় তিনি (আ.) বলেন,

"কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা ঈমানের পাশাপাশি সৎকর্মকেও রেখেছেন। সৎকর্মের সংজ্ঞা হলো এমন কর্ম যাতে বিন্দুমাত্র ত্রুটিও থাকেনা। স্মরণ রেখো! মানুষের কর্মে সব সময় চোর হানা দেয়। সেই চোর কী? (কোন ধরনের চোর লেগে থাকে কর্মের পিছনে?) সেটি হলো রিয়াকারী অর্থাৎ লৌকিকতা, (মানুষ যখন দেখনদারির জন্য কোন কাজ করে) আত্মতৃপ্তি, (অর্থাৎ কোন কাজ করে মনে মনে আনন্দিত ও গর্বিত হয়) আর বিভিন্ন প্রকার অপকর্ম ও পাপ, যা তার দ্বারা সাধিত হয়, সেগুলোর ফলে মানুষের পুণ্যকর্ম ধ্বংস হয়ে যায়। সৎকর্ম সেটি যাতে কোন অন্যায়, আত্মশ্লাঘা, দেখনদারি ভাব, অহংকার এবং মানুষের অধিকার আত্মসাৎ করার বিন্দুমাত্র চিন্তাও থাকেনা। পুণ্যকর্মের মাধ্যমে মানুষ যেভাবে পরকালে রক্ষা পায় একইভাবে সে পৃথিবীতেও রক্ষা পায়। (অর্থাৎ পরকালেও নেককর্মের কল্যাণেই রক্ষা হবে, নেককর্ম যদি থাকে তাহলে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হবেন এবং বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত করবেন। একইভাবে পৃথিবীতেও মানুষ যদি সৎকর্মপরায়ণ হয় তাহলে অনেক জাগতিক দুশ্চিন্তা ও দুঃখকষ্ট থেকে মানুষ রক্ষা পায়।) পুরো ঘরে যদি একজনও সৎকর্ম পরায়ণ মানুষ থাকে তাহলে পুরো ঘর রক্ষা পায়। নিশ্চিত জেনো! তোমাদের মাঝে যদি সৎকর্ম না থাকে তবে

শুধু গ্রহণ করা কোন কাজে আসবে না। চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র লিখে দেওয়ার অর্থ হলো তাতে যা লেখা থাকে তা সংগ্রহ করে তা সেবন করা (ব্যবহার করা।) সে যদি সেসব ঔষধ ব্যবহার না করে শুধু ব্যবস্থাপত্র নিজের কাছে রেখে দেয় তাহলে তার কী লাভ হবে? এখন তোমরা তওবা করেছ তাই ভবিষ্যতে খোদা তা'লা দেখতে চান, এই তওবার মাধ্যমে তোমরা নিজেদেরকে কতটা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করেছ? এখন সেই যুগ এসেগেছে যখন আল্লাহ তা'লা তাকওয়ার মাধ্যমে পার্থক্য করতে চান। অনেকে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আর নিজেদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা যাচাই করে না। মানুষের অভ্যন্তরীণ অমানিশাই ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে অন্যথায় খোদা তা'লা তো খুবই দয়ালু ও কৃপালু। কিছু মানুষ এমন রয়েছে যারা পাপ সম্পর্কে অবহিত থাকে আর কিছু লোক এমনও আছে যারা পাপ সম্পর্কে অবহিতও থাকে না। এ জন্যই আল্লাহ তা'লা স্থায়ীভাবে ইস্তেগফারের ব্যবস্থা করিয়েছেন। (সব সময় ইস্তেগফার করতে থাকা উচিত।) যেন মানুষ সকল পাপের জন্য তা হোক বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ, সে তা জানুক বা না জানুক এবং হাত, পা, মুখ, নাক, কান, চোখ এক কথায় সকল প্রকার পাপ থেকে ইস্তেগফার করতে থাকে। (অর্থাৎ এমন কোন জিনিস বা কর্ম যেন না থাকে অথবা দেহের কোন অঙ্গের যেন এমন কোন ব্যবহার না হয় যার ফলে পাপ হতে পারে। তাই ইস্তেগফার কর যেন শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাপমুক্ত থাকে।) আজকাল আদম (আ.)-এর দোয়া পড়া উচিত আর সেই দোয়া কোনটি? তা হলো, رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (সূরা আল আ'রাফ : ২৪) এই দোয়া আদিতেই গৃহীত হয়েছে। যে ব্যক্তি উদাসীনতায় জীবন অতিবাহিত করে না, সে শক্তির অতীত কোন বিপদে নিপতিত হবে এমনটি মোটেই আশা করা যায় না । (অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা'লার ভয়ে জীবন অতিবাহিত করে সে কখনো অস্বাভাবিক কোন সমস্যা ও বিপদে নিপতিত হয় না।) তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদ আপদ আপতিত হয় না। যেভাবে আমার প্রতি এই দোয়া ইলহাম হয়েছে যে, "رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ" । তিনি (আ.) বলেন, আমার বিশ্বাস হলো সব কিছুই তাঁর হাতে, তা উপকরণের মাধ্যমে করুক বা উপকরণ ছাড়া। " (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৭৪-২৭৬) আল্লাহ্‌ তা'লা কোন মাধ্যম সৃষ্টি করুন বা না করুন সব কিছুই খোদার হাতে রয়েছে। কাজেই এই দোয়া পড়া উচিত আর এই উভয় দোয়ার প্রতি মনোযোগ দিন এবং অনুধাবন করুন।

অতএব প্রত্যেক আহমদীর এবং আমাদের প্রত্যেকের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। আমরা যদি হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.) কে মেনে থাকি তাহলে এই মান্য করা ও বয়আতের সুবাদে আমাদের ওপর যে দায়িত্ব বর্তায় তা কি আমরা পালন করছি? আমি প্রায় সময় খোঁজ নিয়ে দেখেছি, এ বিষয়টি সামনে আসে যে, আমাদের মাঝে এমন অনেকেই আছে যারা সঠিকভাবে নামায পড়েন না, নামাযের প্রতি পূর্ণ মনোযোগই নেই। কিছু মানুষের তো ইস্তেগফারের প্রতি আদৌ মনোযোগ নেই। পরস্পরের অধিকার সংরক্ষণের প্রতি মনোযোগ নেই। অবস্থা যদি এমনই হয় তাহলে আমরা কীভাবে বলতে পারি যে, আমরা সৎকর্ম করছি এবং হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের সুবাদে যে দায়িত্ব বর্তায় তা আমরা পালন করছি? অন্যরা না মেনে পাপ করছে। যারা মানে নি, অস্বীকার করছে তারা পাপ করছে, আর আমরা মানার পর নিজেদের মাঝে পরিবর্তন না এনে এবং একটি অঙ্গীকার করে তা রক্ষা না করার কারণে পাপ করছি। তাই গভীর উৎকণ্ঠার সাথে আমাদের সবার আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত। আল্লাহ্‌ তা'লা করুন, আমরা যেন শুধু প্রথাগতভাবে মসীহ্‌ মওউদ দিবস উদ্‌যাপন না করে বরং মসীহ্‌ মওউদকে মানার সুবাদে যে দায়িত্ব বর্তায়, তা পালনকারীও হই। সকল প্রকার আভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকি। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে সব সময় স্বীয় নিরাপত্তা বেষ্টনীতে স্থান দিন এবং সকল সমস্যা ও বিপদাপদ থেকে রক্ষা করুন।

আজ একটি ঘোষণা রয়েছে বরং এটি একটি আনন্দ সংবাদও বটে। 'আল্‌ হাকাম' পত্রিকা যা কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত হতো, পুনরায় এর প্রকাশনা ১৯৩৪ সনে শুরু হয় এবং আবার বন্ধ হয়ে যায়। আজকে ইংরেজী ভাষায় এখান থেকে সেটি চালু হচ্ছে আর আজকে মসীহ মওউদ দিবসও বটে। এই পত্রিকাটি হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর যুগের প্রথম পত্রিকা ছিল। এটি কম সংখ্যায় ছাপা হবে কিন্তু ইন্টারনেটে পাওয়া যাবে। খুতবার অব্যবহিত পরেই www.alhakam.org ওয়েব সাইটে এটি পাওয়া যাবে। একইভাবে মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট ইত্যাদির জন্য 'আল্‌ হাকাম' নামে অ্যাপও পাওয়া যাবে যা ডাউনলোড করে এই পত্রিকাটি খুব সহজেই পাঠ করা যাবে। এই App প্রচলিত মোবাইল ফোন সিষ্টেম যেমন অ্যাপেল ও এ্যান্ড্রয়েড-এ ডাউনলোড করার জন্য খুতবার অব্যবহিত পরেই পাওয়া যাবে। এবারের সংখ্যাটি মসীহ্‌ মওউদ দিবস উপলক্ষেত বিশেষ সংখ্যা। এরপর থেকে প্রত্যেক জুমুআর দিন নতুন সংখ্যা আপলোড হবে আর ছাপাও হবে কিন্তু সংখ্যায় কম হবে। যাহোক এটি থেকে মানুষ উপকৃত হতে পারে। আল্লাহ্‌ করুন, এবার এই পত্রিকার চালু হওয়া যেন স্থায়ী হয় আর এটি যেহেতু ইংরেজী ভাষায় হবে তাই ইংরেজী ভাষাভাষী মানুষের এটি থেকে বেশি লাভবান হওয়া উচিত।

****

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

সেই মানব যিনি তাঁর অস্তিত্বে, তাঁর গুণাবলীতে, তাঁর কাজে কর্মে, তাঁর নিরন্তর তৎপরতায় এবং আধ্যাত্মিক ও পবিত্র মানসিকক ক্ষমতাসমূহের মাধ্যমে জ্ঞানে, কর্মে, সাধুতায় ও দৃড়তায় সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপনক করেছেন এবং ইনসানে কামেল বা পরিপূর্ণ মানবরূপে অভিহিত হয়েছেন.....সেই ইনসান যিনি সর্বাপেক্ষা কামেল বা পরিপূর্ণ এবং প্রকৃত অর্থেই যিনি ইনসানে কামেল এবং কামেল নবী এবং যাঁর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান ও পুনরুত্থান সংঘটিত হওয়ায় পৃথিবীতে প্রথম কেয়ামত প্রদর্শিত হয়েছে এবং মৃত জগৎ পুনরায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে, সেই কল্যাণমণ্ডিত নবী হচ্ছেন হযরত খাতামুল আম্বিয়া ইমামুল আসফিয়া খাতামুল মুরসালীন ফখরুন্নবীঈন জনাবে মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)। হে আমার খোদা! তুমি সেই প্রিয়তম নবীর উপরে সেই রহমত ও দরূদ বর্ষণ কর, যা তুমি পৃথিবীর আদিকাল থেকে অদ্যবধি অন্য কারো উপরেই বর্ষণ করনি। যদি এই আজিমুশশান, মহামহিমান্বিত নবী দুনিয়ার বুকে না আসতেন, তাহলে যে সকল ছোট ছোট নবী যেমন, ইউসুফ (আ.), আইয়ুব (আ.), মসীহ ইবনে মরিয়ম (আ.), মালাকি (আ.), ইয়াহইয়া (আ.) জাকারিয়া (আ.) ইত্যাদি, তাঁদের সত্যতার স্বপক্ষে আমাদের কাছে কোনও প্রমাণই থাকত না, যদিও তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন খোদা তা'লার প্রিয়পাত্র। এ তো সেই নবীরই (সা.) কৃপা ও অনুগ্রহ যার দরুন এঁরা সবাই পৃথিবীতে সত্য বলে স্বীকৃত হতে পেরেছেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

(ইতমামুল হুজ্জাত, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৮)

আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসুলের মধ্যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রহিয়াছে। (সূরা আহযাব, আয়াত: ২২)

দোয়াপ্রার্থী:

দোয়াপ্রার্থী: আব্দুস সালাম, জামাত আহমদীয়া নারার ভিটা

আল্লাহ্‌র বাণী

যে ব্যক্তি অস্বীকার করিয়াছে তাহার অস্বীকারের কুফল তাহার উপরই আসিয়া বর্তিবে, এবং যাহারা সৎ কর্ম করিয়াছে তাহারা নিজেদেরই জন্য সুখ-শয্যা প্রস্তুত করিতেছে।

(সূরা রওম, আয়াত: ৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: নূর জাহাঁ বেগম, জামাত আহমদীয়া কোলকাতা

“পারিবারিক জীবনকে সুন্দর ভাবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ঘটনার আলোকে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জীবনী”

মূল : মুনীর আহমদ খাদিম সাহেব (এ্যাডিশনাল নাযির ইসলাহ্ ও ইরশাদ দক্ষিণ ভারত) (জহরুল হক, মুবাল্লিগ সিলসিলা, গৌহাটি, আসাম)

সম্মানীয় সভাপতি সাহেব ও শ্রোতামণ্ডলী -

আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু হল : “পারিবারিক জীবনকে সুন্দর ভাবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ঘটনার আলোকে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জীবনী”

হযরত আয়েশা (রাঃ) কে কেউ জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আঁ হযরত (সাঃ)-এর জীবন চরিত সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু বলুন। তখন তিনি (রাঃ) বলেছিলেন- كان خلقه القرآن যদি তোমরা আঁ হযরত (সাঃ)-এর জীবনচরিত সম্পর্কে জানতে চাও তাহলে কোরআন পড়ে নাও। কেননা, তাঁর জীবনচরিত কোরআনের বাহ্যিক রূপ ছিল।

(মুসতাদরাক হাকিম ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা : ৩৯২)

অনুরূপ ভাবে কেউ যদি হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর জীবনচরিত সম্পর্কে জানতে চায় তাহলে তাকে আঁ হযরত (সাঃ)-এর জীবনচরিতকে জানতে হবে। কারণ, হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর জীবন তাঁর প্রিয় আকা ও মুনিব হযরত (সাঃ)-এর জীবনের দর্পণ স্বরূপ ছিল। তাই তিনি একবার বলেন যে,

”من فرق بینی وبین المصطفیٰ ما عرفنی ومارای

অর্থাৎ “যে ব্যক্তি আমাকে এবং আমার প্রিয় নবী হযরত হযরত (সাঃ)-এর সাথে পার্থক্য করার চেষ্টা করে সে আমাকে চিনতে পারেনি, আর আমার উদ্দেশ্যকেও বুঝতে পারেনি।”

বুজুর্গানে উম্মতেরাও একথা বলে গেছেন যে, “ইমাম মাহদী হযরত (সাঃ)-এর আয়না হবে।” সুতরাং হযরত শাহ ওলী উল্লাহ সাহেব মুহাদ্দিস দেহলবী তার নিজ পুস্তক “আল খায়রুল কাসির”-এ বর্ণনা করেন যে,

”حق له ان ینعکس فیه انوار سید المرسلین صلی الله علیه وسلم ویزعم العامة انه اذا نزل الی الارض کان واحدمن الامة کلا بل هوشرح الاسم الجامع المحمدی ونسخة منتسخة منه فشتان بینه وبین الامة“

..........অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদীয়াতে আগমনকারী মসীহ এর জন্য এটা অত্যন্ত জরুরী হবে যে, তার মধ্যে নবী নেতা হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর পরিপূর্ণ জ্যোতির বিকাশ দৃশ্যমান হবে। লোকেরা মনে করেন যে, মসীহ্ মাওউদ যখন আসবেন তখন তিনি শুধু মাত্র একজন উম্মতী হবেন, কিন্তু তা নয়- বরং তিনি তো হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর নামের পূর্ণ বিকাশ হবেন। এবং মহম্মদ (সাঃ)-এর প্রতিচ্ছবি হবে। সুতরাং ইমাম মাহদী (আঃ) এবং এক সাধারণ উম্মতীর মধ্যে বড় পার্থক্য হবে। আর এই কারণে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পারিবারিক জীবন মহম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের প্রতিরূপ হবে।

কোরআন করীমে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, عاشروهن بالمعروف অর্থাৎ নিজ স্ত্রীদের সহিত উত্তম আচরণ কর। তখন আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন যে, خیر کم خیر کم لاهله وانا خیر کم لاهلی অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সবথেকে উত্তম সেই ব্যক্তি যে নিজের স্ত্রীর সহিত সদ্ব্যবহার করে। আর এ বিষয়ে আমি তোমাদের থেকে সর্বাধিক উত্তম। সুতরাং এই নীতি অনুযায়ী যখন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর পারিবারিক জীবনকে লক্ষ্য করি তখন হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর সম্পূর্ণ দর্পণ স্বরূপ দেখতে পাই ইমাম মাহদী (আঃ)-এর পারিবারিক জীবন। তিনি (আঃ) বলেন যে :

“খোদাতা'লা আমার সম্মানীয়, অনুকরণীয় আনুগত্যকারী নবী, যার আধ্যাত্মিক গুণ ও জ্যোতির বিকাশের ফলে, তার আনুগত্য করার ফলে, তার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনের ফলে আমি আমার উপর ঐশী নিদর্শনকে নামতে দেখেছি, আর নিজ মনকে বিশ্বাসে পরিপূর্ণ পেয়েছি। আর এত বেশি পরিমাণে এই অদৃশ্যের নিদর্শন সমূহ দেখেছি যে, তার মধ্য দিয়ে আমি খোদাতা'লাকে দেখেছি। হযরত কামরুল আম্বিয়া মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম. এ. (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এটা নিয়ম ছিল যে, তিনি প্রতিটি ছোট ছোট বিষয়েও হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর আনুগত্য করতেন।

(সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪৯২)

কোন ব্যক্তির পারিবারিক জীবন সম্পর্কে তার নিকটাত্মীয়রা ভালো সাক্ষী দিতে পারে। সুতরাং মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর শ্যালক ডক্টর মীর মহম্মদ ইসমাঈল (রাঃ) বলেন যে : আমি আমার জ্ঞানে কখনো এটা দেখিনি বা শুনিনি যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তার নিজ স্ত্রীর উপরে কখনো রেগে গেছেন বরং সে অবস্থাই দেখেছি যেটা একজন আদর্শ দাম্পত্য সম্পর্কের হয়ে থাকে।

(সীরাত হযরত নুসরাত জাঁহা বেগম সাহেবা, পৃষ্ঠা : ২৩১)

মায়ী ইমাম বিবি সাহেবা যিনি তার নিজ স্বামী ঠিকাদার হযরত মহম্মদ আকবর সাহেবের মৃত্যুর পর হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাড়িতে থাকতেন, তার বর্ণনা : আমরা কখনো হযরত উম্মুল মো'মিনিনকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উপর রাগান্বিত হতে দেখিনি। আম্মজান সর্বদা মসীহ্ মাওউদ (আঃ)কে সম্মান করতেন আর তাঁকে খুশি করার চেষ্টা করতেন।

হযরত মহম্মদ (সাঃ) বলেছেন :

”انماالدنیامتاع ولیس من متاع الدنیاشئی افضل من المرءة الصالحة“

(ابن ماجه، ابواب النکاح)

অর্থাৎ পৃথিবীটা তো সুন্দর জিনিসপত্র দ্বারা সজ্জিত। আর পৃথিবীর সবথেকে সুন্দর জিনিস ভালো নেক স্ত্রী।

(হাকীকাতুস সলেহীন, পৃষ্ঠা : ৩৮৯)

হুজুর (আঃ) তাঁর নিজ স্ত্রীর সাথে সর্বদা সদ্ব্যবহার করতেন। আর হযরত উম্মুল মো'মেনিন (রাঃ) হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়ার উপরে এত দৃঢ় ঈমান ছিল। সাধারণতঃ স্ত্রীরা কখনোই নিজের স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ বা সতীন ঘরে আসা পছন্দ করেন না কিন্তু এতদসত্ত্বেও আম্মাজান মহম্মদী বেগম সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করা উদ্দেশ্যে আন্তরিক ইচ্ছা পোষণ করতেন যে, মহম্মদী বেগমের সাথে তাঁর বিয়ে হোক।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ও হযরত আম্মাজানের সহিত বিশেষ প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক ছিল। আর হাদিসের কথা মত তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের দর্পণ স্বরূপ ছিল। হযরত আম্মাজানের সাথে এহেন ভালোবাসার সম্পর্ক আর বার বার একথা বলা যে, যে নিজের পরিবারের সাথে ভালো ব্যবহার করা দরকার আর তাঁর এই কথা মত যে, যে ব্যক্তি নিজের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম ব্যবহার না করবে সে আমার জামাত ভুক্ত নয়।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃষ্ঠা : ১৯)

এবং সাহাবারাও তাঁদের স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। সুতরাং একবার হযরত মুফতি মহম্মদ সাদিক সাহেব (রাঃ) ও তার স্ত্রীর সাথে কোন বিষয়ে ঝগড়া হয়, আর মুফতি সাহেব তাঁর স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। আর এই কথাটা মুফতি সাহেবের স্ত্রী মৌলবী আব্দুল করীম (রাঃ)-এর স্ত্রীর সম্মুখে বলেন। হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব অনেক দ্রুত ঝগড়ার নিষ্পত্তি করতে পারতেন তাই এই ঝগড়ার কথা নিজ স্ত্রীর নিকট হতে শোনার পর মৌলবী সাহেব মুফতি সাহেবকে বলেন যে, যত দ্রুত সম্ভব ঝগড়াটা মিটিয়ে নিন। কারণ, আপনি তো জানেন এখন মহারানীর রাজত্ব চলছে। হযরত মৌলবী সাহেবের ইশারা এদিকে ছিল যে, যেভাবে ভারতবর্ষে মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব চলছে অনুরূপভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)ও হযরত আম্মাজানের কথা শুনতেন। হযরত মুফতি সাহেব একথা বুঝতে পেরে ঘরে গিয়ে নিজ স্ত্রীর সাথে ঝগড়াটা মিটিয়ে নেন। আর এইভাবে পারিবরিক শান্তি ফিরে আসে।

[যিকরে হাবিব, লেখক হযরত মুফতি সাদিক সাহেব (রাঃ)]

শ্রোতামণ্ডলী! এই জায়গায় এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর যুগেও মহিলাদেরকে কিছু প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছিল, যা দেখে সেই সময়ের হিসাব অনুযায়ী এটাকে অবৈধ স্বাধীনতা মনে করতেন। আর তারা বরতেন যে, এখন তো এমন একটি যুগ এসে উপস্থিত হয়েছে যে, মহিলারা আমাদের সাথে একই সারিতে

দাঁড়িয়ে আছে। একটা সময় এমন ছিল যখন মহিলাদেরকে পুরুষদের মধ্যে নাক গলানোর বা হস্তক্ষেপের অধিকারটুকুও ছিল না। আর হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) সেই পবিত্র আদর্শ যিনি তাঁর নিজ আকা ও প্রভু রসূলে পাক (সাঃ)-এর অনুকরণে নিজ স্ত্রীর প্রতি এমন ব্যবহার করতেন যা দেখে সাহাবারা মারিকার রাজত্ব বলে মনে করতেন।

হযরত আম্মাজানের সঙ্গে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ব্যবহার তদানীন্তন সময়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এমনই বিপরীত ছিল যে, হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোটি (রাঃ)-এর বলেন :

"এ কথাটি অন্দর মহলের কাজের মেয়েদের, যারা অতি সাধারণ নিরীহ গ্রাম্য মহিলা, যারা আড়ম্বনা বা বিড়ম্বনা কিছুই জানত না সাদাসিধা প্রকৃতির তারা খুবই আশ্চর্য হয়ে যেত পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এমনই বৈপরীত্য আচরণে। আমি বার বার তাদেরকে একথা বলতে শুনেছি যে, মির্যা সাহেব তাঁর স্ত্রীর কথা খুব শোনেন।

স্ত্রীর সাথে সুসম্পর্কের কথা উল্লেখ রে উপদেশ দিয়ে হযরত মসহি মাওউদ (আঃ) বলতেন যে, "আমার তো সব তেকে বগ লজ্জার কথা বলে মনে হয় যে, একজন পুরুষ হয়ে মহিলার সাথে ঝগড়া করব। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে পুরুষ তৈরী করেছেন আর এটা আমাদের উপরে খোদাতা'লার একটা পরিপূর্ণ কৃপা। আর এই কৃপার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এটাই যে, আমরা মহিলাদের উপর সদ্ব্যবহার প্রদর্শন করব।

[সীরাত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) পৃষ্ঠা : ৪৫, লেখক- সেখ ইয়াকুব আলী সাহেব ইরফানী (রাঃ)]

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হযরত আম্মাজান (রাঃ)-র হৃদয় কিভাবে জয় করতেন এই সম্পর্কে আম্মাজান (রাঃ)-র একটি বর্ণনা উপস্থাপন করছি। তিনি বলেন :

"আমি যখন প্রথম প্রথম দিল্লি থেকে এখানে আসলাম তখন জানতে পারলাম গুর দিয়ে তৈরী ক্ষীর মসীহ্ মাওউদ (আঃ) পছন্দ করেন। সুতরাং আমি খুব আনন্দের সহিত সেটা রান্না করার ব্যবস্থা করলাম। অল্প কিছু চাল দিয়ে তার চেয়ে চারগুন বেশি গুড় ঢেলে দিয়ে যখন রান্না করলাম তখন সেটা একবারে গুড়ের মতোই হয়ে গেল। আমি যখন চুলা থেকে এই খাবার নামালাম তখন খাবার দেখে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। কারণ, এটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, আর খাওয়ার ও সময় হয়ে যাচ্ছিল। আর আমি দুশ্চিন্তায় ছিলাম এবার কী হবে। আর সেই মুহূর্তে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে আমার মুখটা কাঁদো কাঁদো অবস্থায় দেখে তিনি হাসলেন আর বললেন, কি ব্যাপার খাবার ভালো না দুঃখ। আরও বলেন- এটা তো দারুন হয়েছে। ঠিক আমার মনের মত হয়েছে, এমন বেশি গুড়ই তো আমি পছন্দ করি। এটা তো খুবই সুন্দর । তারপর খুব আনন্দের সহিত সেটা খেলেন।

হযরত উম্মুল মো'মিনিন বলেন : "হযরত সাহেব যখন এতগুলো কথা বললেন তখন আমার মন খুশিতে ভরে গেল।"

(সীরাত হযরত নুসরাৎ জাঁহা বেগম সাহেবা, পৃষ্ঠা : ২২৫-২২৬)

শ্রোতামণ্ডলী! আমাদের মধ্যে কত জনের জন্য এই ঘটনার মধ্যে শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে- যারা একটুখানি লবন তরকারীতে বেশি হয়ে গেলে বা কমে গেলে স্ত্রীদের সঙ্গে কত কঠোর ব্যবহার করি। হযরত মহম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে হাদিসে এ কথা পাওয়া যায় যে, তিনি (সাঃ) কখনো কোন খাবারের প্রতি দোষারোপ করেন নি - বরং যারা খাবার তৈরী করতেন তাদের প্রশংসা ও মন জয় করতেন।

হযরত আম্মাজান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অনেক খেয়াল রাখতেন কিন্তু কখনো কখনো অতিথি বেশি হওয়ার কারণে কোন ত্রুটি অনিচ্ছাকৃত থেকে যেত। আর এই বিষয়ে হুজুর (আঃ)-এর সঙ্গী সাথী সাহাবারাও জানতেন যে হুজুর (আঃ)-এর বেশি পরিশ্রমের কারণে ও অসুস্থতার কারণে বেশি খেয়াল রাখা ও ভালো খাবারের প্রয়োজন হতো।

এই ধরনেরই একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব সিয়ালকোটি (রাঃ) লেখেন যে, মুনশি আব্দুল হক সাহেব লাহোর যিনি পরে আহমদীয়াত ত্যাগ করেছিলেন। তিনি একবার হুজুর (আঃ)কে বলেছিলেন যে,, আপনার কাজ অনেক সূক্ষ্ম এবং আপনার উপরে অনেক দায়িত্ব ন্যস্ত আছে সেজন্য আপনার প্রয়োজন, শরীরের প্রতি খেয়াল রাখুন। এবং একটি বিশেষ ধরনের শক্তিদায়ক খাবার প্রতিদিন তৈরী হওয়া আবশ্যক। তার এই কথার উত্তরে ম=হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন : কথাতো ঠিকই বলেছ, আর আমিও কখনো কখনো এটা বলে থাকি। কিন্তু বাড়ির মহিলারা নিজেরই কাজে ব্যস্ত থাকে আর এদিকে অতো খেয়াল রাখতে পারে না।

তখন এই কথা শুনে মুনশি আব্দুল হক সাহেব বলতে লাগলেন যে, আপনি বকাবকি করেন না, ভয় দেখিয়ে বলেন না, আমার অবস্থা তো এই রকম যে, আমি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা করি আর এটা কখনোই সম্ভব নয় যে আমার কথা লঙ্ঘিত হয়। যদি কেউ আমার কথা না শোনে তাহলে আমি তার খবর নিই। আর ভালোবাসার খাতিরে হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব (রাঃ) এই কথাতে সম্মতি প্রকাশ করেন। আর বলেন যে, মুনশি সাহেব যে কথা বলছে এটা সঠিক। হুজুর (আঃ০-এর ও দরকার এরকম ব্যবহার করা। এই কথা শুনে হুজুর (আঃ) হাসলেন আর বললেন : আমার বন্ধুদের এই ধরনের চরিত্র হওয়া উচিত নয়। হযরত আব্দুল করীম সাহেব (রাঃ) সেই সময় মনে মনে অনেক লজ্জিত হই।

[সীরাত হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ), লেখক- মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব সিয়লকোটি, পৃষ্ঠা : ১৮-১৯]

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) নিজের বই "কিশতিয়ে নূহ" এ উপদেশ দিয়ে বলেন যে, "যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রী ও পরিবারবর্গের সাথে ভালো ব্যবহার না করে সে আমার জামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর এই ভালোবাসার উদাহরণ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কীভাবে তৈরী করেছিলেন তার একটি উল্লেখ আমি করছি। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কন্যা হযরত মোবারেকা বেগম সাহেবা (রাঃ) বলেছেন যে, কীভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁর নিজ শাশুড়ির মন জয় করতেন আর একবার মা ও মেয়ের ঝগড়া সেটা সংশোধন করে দেন। সাহেবযাদী বলেন : "আববাজানের চোখে আম্মাজানের অনেক সম্মান মর্যাদা ছিল। তাই সব সময় আম্মাজানের মন জয় করার কথা ভাবতেন। আর এই ছবি আমার চোখে এখনও রয়েছে। কিন্তু একবার আমি দেখলাম যে, প্রয়োজনে আম্মাজানেরও তরবীয়ত করলেন। একটা ঘটনার উল্লেখ করছি- বাস এই একটাই ঘটনা আমি দেখেছি তাছাড়া কোন ঘটনা আমার চোখে পড়ে নি। আর আম্মাজান তো নিজেই একটা দৃষ্টান্ত ছিল। পরিষ্কার আমার মনে আছে সামনের দরজার দিকে নানীমা বসে ছিল। কোন চাকরাণী নানীমার কথা অমান্য করে কোন কথা বলে দিয়েছিলেন আর তার জন্য আম্মাজান রাগান্বিত হয়ে বসেছিলেন। আর সেই সময়কার কথা আমার মনে আছে, নানীমা রাগে রাগে বলছিলেন মেয়ে শেষমেষ আমরাই তো মেয়ে হ্যাঁ আমার হযরত আমার মাথার তাজ ইত্যাদি ইত্যাদি। আর সেই সময় হযরত আব্বাজান আম্মাজানের ঘাড়ে হাত রেখে আম্মাজানের পিছে পিছে চলে আসছেন। আর আম্মাজানের চোখ থেকে ঝরনা বইছিল- আর আব্বাজান চুপচাপ আম্মাজানের কাঁধে হাত রেখে নানীমার পায়ের নীচে আম্মাজানের মাথা নত করিয়ে দেন । আর তখনই নানীজান আম্মাজানের হাত ধরে উপরে উঠিয়ে সম্ভবত গলায় লাগিয়ে নিয়েছিলেন। আর হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ফিরে চলে গিয়েছিলেন। বর্তমান যুগের বাচ্চারা যা কিছু ভাবুক না কেন বেশিরভাগ এমন হবে যারা মায়ের কোন সম্মান করে না। আহমদী মেয়েরা ও বোনেরা এই চিত্র যেটা আমি দেখেছি আর মনে রেখেছি সেটা নিজ চিন্তা-ভাবনার চোখ দিয়ে দেখ যে, দ্বিনের বাদশাহ্ আর খোদাতা'লার পক্ষ থেকে খাদিজা সম্মান প্রাপ্তা স্ত্রী আম্মাজান (রাঃ)-র যার সঙ্গ পাওয়া এবং তার মান সম্মান এত বেশি করতেন তার সঙ্গে তার মায়ের ছোট একটা ঝগড়া সহ্য না করে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে এসে তার মায়ের পায়ের নীচে ঝুঁকিয়ে দিলেন। তিনি এটাই বলতে চেয়েছিলেন যে, তোমার পদমর্যাদা অনেক বড় তবুও ইনি তোমার মা-তোমারও জান্নাত তোমার মায়ের পায়ের তলাতে রয়েছে। **আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মোহাম্মাদিন ওয়া আলা আবদিহিল মসীহিল মাওউদ।**

শ্রোতামণ্ডলী! ঘরের/বাইরে পারিবরিক যখন কোন যাত্রা হত সেটা হত খুব সুন্দর। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে অনেক সময় খারাপ প্রকৃতির পুরুষদের কাছ থেকে এ কথা শুনতে হয় যে তোমরা দেরী করে দিলে-তাড়াতাড়ি কর - সব সময় তোমাদের এই রকম অভ্যাস- কিন্তু আমাদের প্রিয় আকা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর অভ্যাস কিন্তু তার প্রিয় মুনিব হযরত মহম্মদ মোস্তাফা (সাঃ)-এর মত ছিল। তিনি/ সফরের জিনিসপত্র নিজেই তৈরী করতেন। আর ঘরের লোকদের জন্য অপেক্ষা করতেন। আর প্রথমেই তাদেরকে গাড়িতে চড়াতেন আর সব ধরনের লক্ষ্য রাখতেন। এই বয়সে হযরত মুফতি মহম্মদ সাদিক সাহেব (রাঃ) তার নিজ রচিত বই

"যিকরে হাবিব" এর লিখেছেন যে, "যখন কোন সফর/ যাত্রা হত তো হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) নিজে হযরত আম্মাজান বা মহিলাদেরকে নিয়ে গিয়ে মহিলাদের জায়গায়/ গাড়িতে বসিয়ে দিতেন। আর যখন নামার সময় হত তখন নিজে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের সামনে হযরত আম্মাজানকে নামিয়ে নিতেন। আর যাত্রার/সফরের সময় ও সরাক্ষণ খুদ্দামদের মাধ্যমে আম্মাজানের হাল-হকীকত জিজ্ঞেস করতেন। একটি যাত্রা সম্পর্কে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ প্রথম (রাঃ) উল্লেখ করেছেন যে, একবার হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কোন সফরে ছিলেন আর ট্রেন আসার অনেক পূর্বেই ষ্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিলেন। হযরত আম্মাজানও সঙ্গে ছিলেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আম্মাজানকে সঙ্গে নিয়ে ষ্টেশনে পায়চারি করতে লাগলেন। হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব (রাঃ)-এর চরিত্র অনেকটা জোশিলা ছিল। তিনি আমার কাছে আসেন এবং বলতে লাগেন যে, এখানে তো অনেক মানুষ আছে আর অন্য লোকেরা এদিকে ওদিকে ঘোরে আপনি মসীহ মাওউদ (আঃ)কে গিয়ে বলুন যে, বিবি সাহেবাকে কোথাও আলাদাভাবে বসিয়ে রেখে দিবেন। হযরত খলিফাতুল মসীহ্ (রাঃ) প্রথম বলেন যে, আমি তো বলতে পারব না আপনি বলে দেখে নিতে পারেন। অসহায় হয়ে মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কাছে গেলেন আর বললেন, লোকজন অনেক আছে তাই বিবি সাহেবাকে আলাদা কোথাও এক জায়গাতে বসিয়ে দিন। তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বললেন, যাও আমি তো এই ধরনের পর্দার পরিপন্থী নই। হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেন যে, এই কথা শুনে হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব (রাঃ) মাথা নীচু করে আমার দিকে ফিরে আসে। আর তখন আমি তাকে বলি মৌলবী সাহেব উত্তর নিয়ে এসেছেন ?

(সীরাতুল মাহ্দী ১ম খণ্ড,রেওয়াত নম্বর ৫৫ এবং ৭৭)

স্বামী-স্ত্রীর লড়াই-ঝগড়ার কারণ তাদের মেজাজ মিল না হওয়া। পুরুষরা সব সময় এটা চায় যে, স্ত্রীরা যেন তাদের মেজাজের মত হয়ে যায়। আর স্ত্রীরা ও চায় তার স্বামীর যেন মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এই বিষয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর একটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শুনুন যে, কীভাবে নিজ স্ত্রীর কারণে তিনি তার নিজের স্বভাবের পরিবর্তন করেছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বললেন তিনি অন্ধকারে ঘুমাতে পছন্দ করতেন। হযরত আম্মাজান (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, "আমি আলো জ্বেলে ঘুমাতাম অন্ধকারে ঘুমাতে পারতাম না। আর অন্য দিকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) অন্ধকারে ঘুমাতে পছন্দ করতেন। আর আমার কারণে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আলো জ্বেলে রাখতেন। আর যখন আম্মাজান ঘুমিয়ে পড়তেন তখন আলো নিভিয়ে দেওয়া হত। আম্মাজান আরও বলেন যে, আমি যখন পাশ ফিরতাম তখন আলো জ্বালানোর জন্য বলতান তখন মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আলো জ্বালিয়ে দিতেন। আর শেষ পর্যন্ত হুজুর (আঃ)ও আলোতে ঘুমানোয় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আর আম্মাজানের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সমগ্র ঘর আলোকিত করতেন। আর এ বিষয়ে একবার হযরত আম্মাজান মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কে সম্বোধন করে বলেন, আপনার সেই সময়ের কথা কি মনে আছে- যখন আপনার আলো জ্বেলে ঘুম আসত না, আর আমার আলো ছাড়া ঘুম আসতোও না।

(সীরাত হযরত নুসরাৎ জাঁহা বেগম সাহেবা (রাঃ), পৃষ্ঠা : ৪১০)

শ্রোতামণ্ডলী! ইসলামের সুন্দর পারিবারিক জীবন গড়ে তোলার জন্য পুরুষ এবং মহিলা দুজনকেই সমান দায়িত্ব দিয়েছেন। ছোট ছোট কথার কারণে মনের মধ্যে বিষ তৈরী করা হয়। এবং ছোট ছোট কথাকে বড় করে তুলে ঘরের পরিবেশকে নষ্ট করা একটা ঘৃণ্য বিষয়। বিবাহ বন্ধন তো একটা পবিত্র বন্ধন। যেটা ভালোবাসা, পেম-প্রীতির বন্ধন দিয়ে একে অপরের জন্য শান্তির কারণ হওয়ার জন্য এই পবিত্র মেলবন্ধন। এই বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আদেশের প্রতি কর্ণপাত করা উচিত। তিনি (আঃ) বলেন, "আমার নিকট স্বামী-স্ত্রীর একটি বড় নিয়ামত খোদাতা'লার পক্ষ থেকে। আর মোমেন যেহেতু অনেক খোদাভীরু হয়ে থাকে এবং খোদার ভালোবাসার আশা রাখে । আর আমার মত সেই ঘর জান্নাত হয়ে যায়। আর বরকত নাযিল হয়। যে ঘরে পুরুষ ও মহিলা ভালোবাসা, প্রেম-প্রীতি ও একে অপরকে সম্মান দিয়ে একসাথে বসবাস করে।

(মাকতুবাতে আহমদ, ২য় খণ্ড, মাকতুব ৩৭, পৃষ্ঠা : ৫০)

সম্মানীয় শ্রোতামণ্ডলী ! হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজ ইলহাম নরম ভাব প্রদর্শন কর নরম ভাব প্রদর্শন কর। কেননা, সমস্ত নেকীর জড় নম্রতা। তিনি ও আরও বলেন "এই ইলহামের মধ্যে সমস্ত জামাতের এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, নম্রতা অবলম্বন কর, আর বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ কর। মহিলারা পুরুষদের সম্পত্তি নয়। বরং বিবাহিত পুরুষ এবং মহিলার একটি ইচ্ছাকৃত বন্ধন। আর চেষ্টা কর যে, নিজ অঙ্গীকারে যেন ধোকা না হয়। আল্লাহতা'লা কোরআন শরীফের মধ্যে বলেছেন যে, "অর্থাৎ নিজ স্ত্রীদের সাথে ভালো ব্যবহারের সাথে জীবন যাপন কর। আর হাদিসে আসে যে, "খায়রুকুম খায়রুকুম লি-আহ্লিহি" অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে নিজ স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করে। সুতরাং দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক ভাবে নিজ স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহার করো। তাদের জন্য দোয়া করতে থাক আর তালাক থেকে বিরত থাক। কেননা, খোদার কাছে সব থেকে বেশি খারাপ সেই ব্যক্তি যে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করে। যেটা খোদতা'লা জুড়ে দিয়েছেন সেটা নোংরা বাসন পত্রের মত ভেঙ্গে ফেলো না।

(জামিমা তোহফা গুলড়বিয়া, রুহানী খাজায়েন ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৭৫, হাসিয় তাযকেরা পৃষ্ঠা : ৩৯৬-৩৯৮)

তিনি আরও বলেন অনুরূপভাবে লোকজন মহিলা ও শিশুদের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে সমাজে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে থাকে। আর সঠিক রাস্তা থেকে দূরে সরে গেছে। সোজা রাস্তা থেকে সরে গিয়েছে। কোরআন শরীফে লেখা আছে وعاشروهن بالمعروف কিন্তু এখন এর বিপরীত কার্যকলাপ চলছে, দুই ধরনের লোকজন এই বিষয়ে দেখা যায় । এই ধররে লোকেরা তো মহিলাদেরকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রেখেছে। অর্থাৎ বেহায়াপনা করার পরিষ্কার খোলা দিয়ে রেখেছেন। আর দ্বিনের কোন প্রভাব তাদের মধ্যে দেখা যায় না। আর তারা প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধীতা করে থাকে আর কেউ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে না।

আবার এক ধরনের লোক এমন আছে যারা খোলা তো রাখেনা কিন্তু এত বেশি পরিমানে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে যা দেখে মানুষ এবং পশুর মধ্যে পার্থক্য করা অসম্ভব হেয় যায়। আর পশুর থেকেও অধিক খারাপ ব্যবহার তাদের সঙ্গে করা হয়ে থাকে। যখন মারে বা আঘাত করে তখন এমন নিষ্ঠুর হয়ে যায় যে, তারা এটা ভুলে যায় যে, আগে কোন জীবন্ত জিনিস আছে কি-না। আসলে তারা অনেক খারাপ ব্যবহার করে।

পাঞ্জাবে তো উদাহরণ বিখ্যাত আছে যে, মহিলাদেরকে জুতোর সঙ্গে তুলনা করা হয়। তারা বলে যে, একটি পরে নিলাম আর একটি খুলে দিলাম যখন চাইলাম। এটা বড় খারাপ কথা, আর ইসলাম বহির্ভূত কথা। রসূলে করীম (সাঃ) আমাদের জন্য পরিপূর্ণ উদাহরণ। মহম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী আমাদের দেখা উচিত কেমন সুন্দর ব্যবহার তিনি মহিলাদের সাথে করতেন। আমার কাছে তো ঐ ব্যক্তি ভীরু আর কাপুরুষ যে মেয়েদের সাথে লড়াই ঝগড়া করে।

(মালফুযাত ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৯৬, আলহাকাম ১০ এপ্রিল ১৯০৩)

শ্রোতামণ্ডলী! পারিবারিক জীবনকে শান্তিময় করে তোলার আর একটি উপায় হল সন্তানদের সুশিক্ষিত করে তোলা। যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সু-সম্পর্ক থাকে, একে অপরের প্রতি সম্মান থাকে এবং আমানতদার হয়, তাহলে তার প্রভাব সন্তানদের উপরেও পড়ে। আঁ হযরত (সাঃ)-এর কথা হল - اكرموا اولادكم واحسنوا ادبهم অর্থাৎ নিজ সন্তানদের সম্মান কর আর তাদেরকে ভালো করে আদব কায়দা শেখাও।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন যে, - "তোমরা নিজেরা নেক হয়ে যাও আর সন্তানদের জন্য একটি নেক উদাহরণ হয়ে যাও। আর সন্তানকে মুত্তাকি আর মনের মত করে গড়ে তোলার জন্য দোয়া কর । আর তাদের খাতিরে চেষ্টা কর, যতটা চেষ্টা তুমি অর্থ জমা করার জন্য কর। আর এই কারণে সন্তানদের মঙ্গলের জন্য ভালো কাজ কর, নেক নমুনা হয়ে যাও। যার থেকে সন্তানরা তোমার নিকট হতে কিছু শিখতে পারে। আর এই জন্য সর্ব প্রথম কাজ হল আত্মসংশোধন। যদি তুমি প্রথম সারির মুত্তাকি ও পরহেজগার হয়ে যাও এবং খোদাতা'লার সন্তুষ্টি অর্জন কর তাহলে বিশ্বাস করা যায় যে, খোদাতা'লা তোমার সন্তানদের সাথে ও উত্তম আচরণ করবে।

(মালফুযাত ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১০৯-১১০, ১৯৮৫ সনের সংস্করণ লন্ডন থেকে প্রকাশিত)

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জীবনীর একটি সুন্দর দিক ছিল- তিনি

বাচ্চাদের মধ্যে সর্বদা সত্যতা আর দিয়ানতদারীর শিক্ষা দিতেন। আর তাদের চরিত্র গঠনের জন্য জোর জবরদস্তির চেয়ে দোয়া এবং নিজ নমূনাকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। সুতরাং একটা ছোট ঘটনা এই বিষয়কে খুব ভালো ভাবে উদ্ভাসিত করে তোলে।

হযরত মুনশি জাফর আহমদ সাহেব কপুরথলা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) শুয়েছিলেন আর সৈয়্যদ ফজল আহমদ শাহ্ সাহেব হুজুরের পা টিপে দিচ্ছিলেন এবং হুজুর ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ফজল আহমদ শাহ্ সাহেব আমাকে ইশরা করে বললেন প্যাকেটের মধ্যে কিছু শক্ত জিনিস আছে। আমি সেটা হাত দিয়ে বের করে দিই, তখন হুজুর (আঃ)-এর চোখ খুলে যায়। অর্ধ ভঙ্গ ঘড়ির চাবি আর দুটি টুকরো ছিল। এটা যখন আমি ফেলতে লাগলাম তখন হুজুর (আঃ) বললেন : "এটা নিয়ে মিঞা মাহমুদ খেলতে খেলতে আমার পকেটে রেখে দিয়েছে। আর এটা আপনি ফেলবেন না। আমার পকেটেই রেখে দিন। কেননা, সে আমাকে আমানতদার হিসাবে এটা রেখেছে। আর ও যখন চাইবে তখন আমি কোথা থেকে দেব ? তারপর সেই জিনিসগুলি আবার পকেটের মধ্যেই ঢুকিয়ে নেন। এই ছোট একটা ঘটনা থেকে জানা যায় যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিজ নমুনার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ছোট বেলা থেকে বাচ্চাদের মধ্যে সততা আমানতদারী তৈরী করার কত বড় চেষ্টা করতেন।

অনুরূপভাবে তিনি (আঃ) কখনোই অস্বস্তি বোধ করতেন না, বাচ্চারা বার বার দুষ্টুমি করলেও। হযরত ডক্টর মীর মহম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মিঞা বশীর আহমদ যখন ছোট ছিলেন তখন একটা সময় তার চিনি বা গুড় খাওয়ার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল আর সব সময় মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কাছে পৌঁছাতো আর হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলত আব্বা পিপড়ে। হযরত সাহেব লিখতে পড়তে ব্যস্ত থাকতেন তবুও উঠে পড়তেন ঘরে যেতেন আর চিনি বের করে নিয়ে এসে তাকে দিতেন। আর আবার লেখায় ব্যস্ত হয়ে যেতেন। কিছুক্ষণ পরে আবারও মিঞা মাহমুদ ঘরের মধ্যে এসে পৌঁছে যেত আর বলত আব্বা পিপড়ে। আর এই শব্দের অর্থ ছিল সাদা রঙের চিনি.....তখন হযরত সাহেব আবারও উঠে যেতেন আর তার ইচ্ছা পূরণ করতেন। এই রকম ভাবে ঐ সময় এই ধরনের কর্মকাণ্ড সারা দিনে অনেকবার হত। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লেখায় ব্যস্ত থাকা সত্বেও কিছু বলতেন না বরং প্রতিবারই সেই বাচ্চার জন্য উঠতেন।

(সীরাতুল মাহদী পৃষ্ঠা : ৮২৩-৮২৪)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বাচ্চাদেরকে দৈহিক শাস্তি দেওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি বলতেন- উত্তম আচরণ ও ভালোবাসা দিয়ে বাচ্চাদের তরবিয়ত করা উচিত।

এই ব্যাপারে হযরত কামরুল আম্বিয়া হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) বলেন যে, আমাকে মৌলবী শের আলী (রাঃ) বলেছেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বাচ্চাদেরকে দৈহিক শাস্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিলেন। আর যদি কোন শিক্ষক সম্পর্কে এ কথা জানতে পারতেন যে, সে বাচ্চাদেরকে মারে তাহলে তিনি (আঃ) অত্যন্ত রাগান্বিত হতেন। আর বলতেন যে, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান শিক্ষক তারা যারা প্রজ্ঞার সাহায্যে কাজ নেয়। একবার মাদ্রাসাতে একটা বাচ্চাকে মারধোর করা হয়েছিল সেইজন্য তিনি (আঃ) বড় কড়া ভাবে বলেছিলেন যে, "যদি এরকমই হয় তাহলে আমি সেই উস্তাদকে মাদ্রাসা থেকে রেব করে দেব।"

(সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৯৮)

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তো একবার এটাও বলেছিলেন যে, বাচ্চাদেরকে এই ভাবে মারা আমার কাছে শির্ক বলে মনে হয়। (কোন কোন সময় পিতাদের বাচ্চাকে সাজা দেওয়ার অনেক আগ্রহ দেখা যায়।) মনে হয় যে, এই খারাপ অভ্যাস দ্বারা সে নিজেকে খোদা মনে করে বসে। একজন জোশিলে মানুষ যখন কথার সাজা দেয় তখন রাগান্বিত হয়ে বাড়তে বাড়তে শত্রুর রং ধারণ করে নেয়। আর যতটা সাজা দেওয়ার দরকার ছিল তার থেকে বেশি সাজা দিয়ে থাকে। যদি কোন ব্যক্তি খোদার হয় আর নিজ আত্মার উপরে নিয়ন্ত্রণ থাকে আর তাহম্মুলের সাথে থাকতে পারে আর বুরদবার এবং শান্তি প্রিয় মানুষ হয় তাহলে তার অধিকার রয়েছে। (যে, সে- রাগের মধ্যে না পড়ে চরিত্র সংশোধনের জন্য কিছু অল্প সাজা দিবে) সে পরিস্থিতি অনুযায়ী অল্প সাজা বা চোখ রাঙানি করতে পারে বা ক্ষমাও করে দিতে পারে। কিন্তু রাগান্বিত বা বদহাওয়াস হয়ে সাজা দেওয়া সমিচীন নয়।

তিনি আরও বলেন যে, "যেভাবে সাজা দেওয়ার ব্যাপারে চেষ্টা করা হয় যদি সেটা দোয়া করার ব্যাপারে চেষ্টা করা হয় তাহলে এটা অনেকটা ভালো হবে। কারণ, পিতা-মাতার সঠিক দোয়া বাচ্চাদের জন্য গৃহিত হয় খোদার দরবারে।

(মালফুযাত ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩০৮-৩০৯, আলহাকাম ১৭ জানুয়ারী ১৯০০)

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জীবনীর এটাও একটা বড় সুন্দর দিক ছিল যে, কোন জিনিস নষ্ট হয়ে গেলে বা ক্ষতি হলে বাচ্চাদেরকে সাজা দিতেন না বরং ক্ষমা করে দিতেন। হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব (রাঃ) আলহাকামে লিখেছেন যে, "মাহমুদ তখন চার বছরের বাচ্চা হবে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তার নিজ অভ্যাস অনুযায়ী ভিতরে বসে লিখছিলেন। মিঞা মাহমুদ সেখানে দেশলাই নিয়ে গিয়ে আগুন জ্বালাতে তৎপর, সেখানে আরও কিছু বাচ্চা ছিল, তাদের সঙ্গে খেলা করছিল আর ঝগড়াও করছিল, আর হঠাৎই মনের মধ্যে কোন খেয়াল আসে আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কাগজগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয় আর হাসতে শুরু করে। আর তালি বাজাতে থাকে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) লেখায় এত ব্যস্ত ছিলেন যে, মাথা উঠিয়ে এটাও দেখলেন না যে, কি হচ্ছে। আর এরই মধ্যে আগুন নিভে যায়। আর সেই দামী কাগজ গুলি ছাই হয়ে গেল। আর বাচ্চারা আবারও অন্য খেলায় মগ্ন হয়ে যায়। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁর লেখা মেলানোর সময় কোন পুরানো কাগজ দেখার প্রয়োজন হয়। কাগজের কথা বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করলে সবাই নীরব থাকে। তখন একজন বাচ্চা বলে যে, মিঞা সাহেব তো সমস্ত কাগজ জ্বালিয়ে দিয়েছে। আর সেই সময় সমস্ত মহিলা ও বাচ্চারা মুখে আঙুল দিয়ে চিন্তায় ব্যস্ত যে, এবার কী হবে। আর সকলেই নিজ নিজ অভ্যাস অনুযায়ী অপেক্ষা করছিল যে, এবার কী হবে সেটাই দেখার। কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) হেসে হেসে বলেন যে, যা হয়েছে সেটা ভালোই হয়েছে। এর মধ্যে খোদাতা'লার কোন প্রজ্ঞা ছিল। আর খোদাতা'লা চাইছে যে, এর থেকে কিছু ভালো প্রবন্ধ আমাকে বোঝাবেন।

[সীরাত হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ), (সেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী)]

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যেখানে জাগতিক শিক্ষা এবং প্রতিদিনের পড়াশোনার ব্যাপারে দৈহিক সাজা দেওয়াটা সঙ্গত মনে করতেন না। কিন্তু দ্বিন শেখার ব্যাপারে দৈহিক সাজাও দিতেন। একারণে যে, বাচ্চা অবস্থা থেকে যেন দ্বিন সম্পর্কে মনের মধ্যে সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়।

হযরত আম্মাজান (রাঃ) এই ধরনেরই একটি ঘটনা হযরত মিঞা বশীর আহমদ (রাঃ)কে বলেছিলেন : "একবার তোমাদের ভাই মৃত মোবারক আহমদ সাহেব দ্বারা বাচ্চা অবস্থায় অজ্ঞাত ভাবে কোরআন মজিদের কোন অসম্মান সে করে ফেলে। আর এই ঘটনাটি দেখে মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর এত রাগ হয় যে, চেহারা লাল হয়ে যায়। আর তিনি (আঃ) রাগে মোবারকের ঘাড়ের উপর একটি থাপ্পড় মারেন যার ফলে তার কচি শরীরে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর হাতের দাগ বা নিশানা পড়ে যায়। আর তিনি (আঃ) রাগে বলেন যে, একে এখনই আমার সামনে থেকে নিয়ে যাও। হযরত মিঞা বশীর আহমদ সাহেব বলেন যে, হযরত মোবারক আহমদ সাহেব আমাদের ভায়েদের মধ্যে সব চেয়ে ছোট ছিল। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জীবদ্দশায় সে মৃত্যুবরণ করে। এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাকে অনেক ভালোবসতেন। সুতরাং তার মৃত্যুর পর তার কবরের কাতবাতে কবিতার লাইন লেখা হয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর পক্ষ থেকে সেটা হল।

হৃদয়ের টুকরো মোবারক তার চেহারা ছিল পবিত্র। আজকে সে আমাদেরকে দুঃখিত করে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিল।

এ সত্বেও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কোরআনের বেহুরমতিকে পছন্দ করেন নি সাজা প্রদান করেছেন।

(সীরাতুল মাহদী ২য় খণ্ড, রেওয়াত পৃষ্ঠা : ৩২৫)

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জীবনের সুন্দর দিক এটাও ছিল যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর সুন্নত এর উপর আমল করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাহিনী (নীতিবাচক) দ্বারা বাচ্চাদের চরিত্র গঠন করার চেষ্টা করতেন। সুতরাং একবার যখন অনেক অতিথি আসার ফলে ঘরের লোকেদের চেহারার মধ্যে বিরভাবের ছাপ দেখা দেয়, তখন তিনি (আঃ) ঘরের লোকজনদের একটি শিক্ষা মূলক গল্প শোনালেন- হযরত মুফতি মহম্মদ সাদিক সাহেব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে,

"যখন আমি ১৯০১ সনে হিজরত করে কাদিয়ান চলে আসি আর নিজ বিবি বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে আসি। তখনকার এক রাতের ঘটনা এরকম যে, রাত্রি বেলাতে কিছু অতিথি এসে যায়, আর তাদের জন্য জায়গা কোথায় হবে এ বিষয়ে আম্মাজান চিন্তিত হয়ে যায়। কেননা, সমস্ত ঘর তো প্রথম থেকে নৌকার মত পরিপূর্ণ ছিল। এখন এই লোকজনদের কোথায় জায়গা দেওয়া হবে। ঐ সময় হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) অতিথিদের সসম্মান করার ব্যাপারে এক জোড়া পাখির ঘটনা বিবি সাহেবাকে শোনালেন যেহেতু আমি একদম পাশের ঘরের ছিলাম, আর আমার নিকট খুব সহজেই আওয়াজ আসছিলো সেই কারণে আমি সমস্ত কাহিনী শুনলাম। তিনি (আঃ) বললেন, দেখো একবার একটি জঙ্গলে একজন মুসাফিরের সন্ধ্যা হয়ে যায় রাত্রি অন্ধকার ছিল। আর কাছাকাছি কোন গ্রাম দেখতে পেল না। আর অসহায় অবস্থায় একটি গাছের নীচে শুয়ে রাত্রি বাস করার জন্য সে বসে গেল, আর সেই গাছের উপরে একটি পাখির বাসা ছিল আর পাখি দুটি নিজেদের মধ্যে কথা বরতে শুরু করল যে, দেখো এই মুসাফির আমাদের বাসার নীচে বসে রয়েছে, তাই এই ব্যক্তি আজ আমাদের অতিথি। আর আমাদের কর্তব্য হবে যে, আমরা যেন এর আতিথেয়তা করি। এতে দুজনেই সহমত হয়ে সেই শীতের রাতে মেহমানকে তাপ প্রদান করার জন্য নিজেদের বাসাটাকে নীচে ফেলে দিল তার থেকে আগুন জ্বালিয়ে কিছু গরম পাবে। সুতরাং তারা এটাই করল নিজেদের সম্পূর্ণ বাসাটা নীচে ফেলে দিল। ঐ টুকরো গুলো একত্রিত করে মুসাফির আগুন জ্বালাল আর গরম সেকতে লাগল। তখন গাছের উপর বসে পাখি দুটি পরামর্শ করল আমরা তো মেহমানকে আগুন সেকার জন্য জ্বালানী দিলাম। এখন রকার যে, আমরা যেন ওকে খাবার জন্য ওকে কিছু দিব। আর খাবারের জন্য তো আমাদের জন্য কিছু নেই, তাই আমরা নিজেরাই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ি আর আমাদেরকে জ্বালিয়ে মুসাফির খেয়ে নেবে আর তার ক্ষুধা নিবারণ হবে। সুতরাং পাখি দুটি এরকমই করল। আর মেহমান নওয়াজির হক পরিপূর্ণ করল।

(যিকরে হাবিব, পৃষ্ঠা : ৩৮৫-৩৮৭, লেখক- মুফতি মহম্মদ সাদিক সাহেব)

তো এটা ছিল হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর নসিহত করার পদ্ধতি ঘরের লোকেদেরকে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জীবনের একটি খুব সুন্দর দিক এটাও ছিল যে, বাচ্চাদের সাথে শুধু খোদাতা'লার খাতিরে ভালোবাসতেন।

হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি (আঃ) বাচ্চাদের খেয়াল এভাবে রাখতেন যে, বাহ্যিকভাবে যদি একজন দেখেন তবে মনে করবেন যে, তিনি (আঃ) বাচ্চাদের সাথে সব থেকে বেশি মহব্বত করতেন। আর যখন বাচ্চারা অসুস্থ থাকতেন তখন তাদের দেখাশোনা ও খেয়াল এত বেশি পরিমাণে করতেন যে, মনে হত তাঁর আর কোন কাজই নেই। কিন্তু আমরা যদি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখি তাহলে দেখতে পাব যে, এ সমস্ত কিছু আল্রাহ তা'লার খাতিরে তিনি করতেন। আর খোদাতা'লার জন্য তার দুর্বল সৃষ্টির সেবা এবং চরিত্র গঠনই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি (আঃ)-এর মেয়ে আসমৎ সাহেবা লুধিয়ানাতে অসুস্থ হয়ে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হন। আর তখন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তার জন্য এমন ভাবে ঔষধাধির ব্যবস্থা করতেন যেন মনে হত এই মেয়েকে ছাড়া তিনি বাঁচতেই পারবে না। একজন বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটাই মনে করবে যে, "হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বাচ্চাদের জন্য অত্যন্ত আকাঙ্খিত কিন্তু যখন ঐ বাচ্চিটা মৃত্যুবরণ করল তখন মসীহ মাওউদ (আঃ) এমন ভাবে ভুলে গেলেন যে, ঐ বাচ্চিটি কোন জিনিসই ছিল না। আর কখনই তিনি (আঃ)-এমনভাবে সাহেবযাদা মির্যা মোবারক আহমদ সাহেবের অসুস্থতার সময় তিনি দিবারাত্রি এটা কর্মের মাধ্যমে করে দেখিয়েছেন যে, সন্তানদের কিভাবে শরীরের খেয়াল রাখা দরকার।

[সীরাত হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ), লেখক-সেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী (রাঃ)]

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বাচ্চাদের তরবিয়তের জন্য ছোট অবস্থাতেই কোরআন মজিদ শেখানো এখন খতম করাতে বিসমিল্লাহ্‌ ও আমীনের সুন্নত জারী করেছিলেন। সুতরাং জামাতে ১৮৯৭ সন থেকে এই রীতি-রেওয়াজ চলে আসছে যে, যদি তার পুত্র হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) যখন কোরআন মজিদ খতম করলেন তখন হুজুর (আঃ) তার তাকরীবে আমীনের প্রোগ্রাম করেন। আর সেই প্রোগ্রামের কারণে বাইরে থেকেও লোকজনকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। আর একটি বড় দাওয়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল আর সেই প্রোগ্রামের জন্য একটি নজম লেখেন- যেটা মাহমুদে আমীন নামে খ্যাত। যার দুটি পংক্তি এরূপ যে,

তুই আমাকে এই দিন দেখিয়েছিস যে, মাহমুদ পড়ে এসেছে আমি এটা মনের মধ্যে থেকে খোদা তোমারই হামদ ও প্রশংসা বের হচ্ছে যে, যা হাজার হাজার শুকরে খোদা যা হাজার হাজার শুকরে খোদা এটা প্রতি দিনের শুভ বাণী যে, হে খোদা প্রতিদিন আমি তোমার এই পবিত্র সুন্নত অনুযায়ী হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জামাতের মধ্যে কোরআন শিক্ষার একটি নতুন রাস্তা তৈরী করে দেন। আলহামদুলিল্লাহ॥ এই পদ্ধতি অনুযায়ী প্রত্যেকটি ঘরে তরবিয়তের একটি দায়িত্ব পালন হচ্ছে।

শ্রোতামণ্ডলী! খাকসার এখন নিজের বক্তব্যের শেষে আমাদের জীবনে নিজ সন্তানের চরিত্র গঠনের বিষয়ে সৈয়্যেদনা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর একটি মহান কথার উল্লেখ যেটা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খফিাতুল মসীহ্‌ আল খামিস (আইয়েদাহুল্লাহো তায়ালা বেনাসরিহিল আযিয) ২০০৪ সনের ২জুলাই এর খোতবায় তুলে ধরেছেন যেটা খোতবাতে মাসরূর পৃষ্ঠা ৪৬২ ও ৪৬৩ তে লেখা আছে সেটা পড়ে আমি বক্তব্য শেষ করছি।

হযরত আমিরুল মো'মিনিন (আইয়েদাহুল্লাহো তায়ালা বেনাসরিহিল আযিয) বলেন যে, পুরুষদেরকে একজন দায়িত্ববান হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে, নিজে মুত্তাকি হবে এবং নিজে নামাজের পাবন্দ হবে। রাত্রিতে উঠে নামাজ পড়া বা কম সে কম ফজরের সময় তো অবশ্যই নামাজের জন্য উঠতে হবে। আর নিজ স্ত্রী ও সন্তানদের নামাজের জন্য উঠাবে। যে ঘর এই ধরনের এবাদতে ভরা থাকবে সেই ঘরে আল্লাহতা'লার ফজল ও নাযিল হবে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, চেষ্টা তখনই সাফল্য পাবে যখন চেষ্টার সাথে দোয়াও করতে থাকবে।

শুধুমাত্র ঘুম থেকে উঠিয়ে দুটো সেজদা করালে হবে না বরং অনবরত দোয়াও করতে থাকতে হবে। নিজের জন্য নিজের বিবিবাচ্চার জন্য। সেই জন্য নিজ নামজেও নিজের স্ত্রী-সন্তানদের জন্যও দোয়া করতে থাকতে হবে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন যে, আল্লাহতা'লা কোরআন মজিদে এই দোয়া শিখিয়েছেন যে, اصلح لی فی ذریتی অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌ আমার স্ত্রী-পুত্রর সংশোধন কর। নিজ অবস্থার পবিত্র পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজ স্ত্রী পুত্রের জন্য বিশেষ দোয়া করতে থাকা উচিত। কেননা, বেশিরভাগ ঝগড়া ঝামেলা সন্তানের ও স্ত্রীর কারণে হয়ে থাকে। সুতরাং মানুষের উপরে অনেক মুশকিল এদের কারণে এসে থাকে। তার জন্য এদের সংশোধনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া উচিত। আর এদের জন্য দোয়াও করা দরকার।

(মালফুযাত ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪৫৬-৪৫৭, ২রা মার্চ ১৯০৮ সন)

তিনি (আঃ) আরও বলেন যে, "আমার তরীকা এটা হল যে, আমি যখন দোয়া চাই তখন প্রতিদিন কিছু দোয়া চাই, সেগুলি এইরূপ যে, হে আল্লাহ্‌ আমার দ্বারা সেই কাজ সম্পাদন করাও যার দ্বারা তোমার মহিমার প্রকাশ ঘটে। আর তোমার অনুগ্রহের বর্ষণ যেন বর্ষিত হয় আমার উপরে। দ্বিতীয়ত এর পর আমি আমার ঘরের লোকজনের জন্য দোয়া চাই যেন তারা আমার চোখের প্রশান্তির কারণ হয়। আর তারা যেন আল্লাহ তা'লার ইচ্ছানুযায়ী চলতে পারে।

অর্থাৎ চোখের প্রশান্তির সাথে সাথে যেন আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহের উপর রাজি থাকতে পাারে।

আর তৃতীয়ত : আমি আমার সন্তানদের জন্য দোয়া করতে থাকি যে, তারা যেন দ্বীনের প্রকৃত সেবক হতে পারে।

আর চতুর্থত : আমি আমার প্রিয় বন্ধুগন সকলে নাম নিয়ে দোয়া করতে থাকি।

পঞ্চমত : তারপর ঐ সমস্ত বন্ধুদের জন্য যারা আমারই সিলসিলারই মধ্যে যুক্ত আছে তাদের আমি চিনি অথবা না চিনি।

(মালফুযাত ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা : ৩০৯, আলহাকাম ১৭ জানুয়ারী ১৯০০)

আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদেরকে সত্যিকারের কর্তব্য পালন করার ক্ষমতা দান করুন। আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের পক্ষ থেকে যেন প্রকৃত শান্তি পাই আর নিজের চোখ ঠান্ডা হওয়ার সামান তৈরী হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'লা ব্যবস্থা করুন। আল্লাহ তা'লার এবাদতকারী হোক। আর নেকীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকুক। আমিন।

(খোতবাতে মাসরূর, খোতবা জুমআ বয়ান ফরমুদা ৪৬৭ পৃষ্ঠা)

****

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর গৃহীত দোয়াসমূহের ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী

মূল: মহম্মদ হামীদ কওসার, নাযির দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ মারকাযিয়া কাদিয়ান, অনুবাদ: আজীবুর রহমান , মুরুব্বী সিলসিলা

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

(সূরা তওবা, আয়াত: ১০৩)

হে আমার দার্শনিকগণ দোয়ার শক্তিটাকে একবার দেখ যে, সে অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করে দেয়।

সম্মানীয় সভার সভাপতি মহাশয় ও প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী!

আমার বক্তব্যের বিষয় বস্তু হল "হযরত খলিফাতুল মসীহ্ পঞ্চম (আই.)-এর দোয়া গ্রহণীয়তার ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী"

প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী! যে আয়াতটি আপনারা শ্রবণ করলেন এর অর্থ হল, হে রাসূল তুমি তাদের সম্পদ থেকে এজন্য সাদকা নাও, যেন তুমি তাদেরকে পবিত্র করতে পার এবং তাদের উন্নতির কোন ব্যবস্থা যেন হয়ে যায়। এবং তাদের জন্য দোয়ায় রত থাক। কেননা, তোমর দোয়ার ফলে তারা আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করবে। আল্লাহ তা'লা তোমার দোয়া অধিক গ্রহণকারী এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'লা হযরত মহম্মদ (সাঃ)-কে এই আদেশ দিয়েছেন যে,

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ

অর্থাৎ তুমি তাদের জন্য দোয়ায় রত থাক কেননা তোমার দোয়ার ফলে তারা আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করবে।

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) এক জায়গায় লেখেন যে, "খলিফা প্রকৃতপক্ষে রাসূলের প্রতিচ্ছবি স্বরূপ হয়ে থাকে। কোন মানুষের জন্য চিরকাল বেঁচে থাকাটা সম্ভব নয়। অতএব খোদাতা'লা ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, রসূলের অস্তিত্ব পৃথিবীর সকল অস্তিত্বের চেয়ে উৎকৃষ্ট। তা যেন কেয়ামত পর্যন্ত ছায়া রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। অতএব এই উদ্দেশ্যের জন্যই আল্লাহ তা'লা খিলাফতকে নির্ধারণ করেছেন, যেন জগৎ কখনো রেসালতের কল্যাণ হতে বঞ্চিত না থাকে।

(শাহাদাতুল কোরান, রুহানী খাযায়েন ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৫৩)

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন - "প্রিয়ভাজনদের সাথে আল্লাহ তা'লার এক বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয়ে থাকে। কখনো সে তাদের দোয়া গ্রহণ করেন, কখনো আবার সে নিজের ইচ্ছাকে তাদের মাধ্যমে পূরণ করান। যেভাবে তোমরা দেখছো যে, বন্ধুত্বের মাঝে এরূপ সম্পর্ক হয়ে থাকে, কখনো এক বন্ধু অপর বন্ধুর কথাকে মেনে নেয় এবং তার ইচ্ছানুসারে কাজ করে থাকে। আবার এরূপ ও হয় যে, সে নিজের ইচ্ছা তার মাধ্যমে পূরণ করার চেষ্টা করে। আল্লাহ তা'লা পবিত্র কোরআনের এক জায়গায় মো'মিনদের দোয়া গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং বলেন- ادعونی استجب لکم অর্থাৎ তোমরা আমার নিকট চাও আমি তোমাদের দোয়া গ্রহণল করব। এবং অপর এক স্থানে নিজের পক্ষ হতে অবতীর্ণ সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট থাকার শিক্ষা প্রদান করেন যেমনটি আল্লাহ তা'লা বলেন -

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ

(সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৬)

অতএব এই দুই আয়াতকে একত্রে অধ্যয়ন করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, দোয়া গ্রহণীয়তার ব্যাপারে আল্লাহ তা'লার সুন্নতটা কী এবং প্রভু প্রতিপালক ও তার বান্দাদের মাঝে সম্পর্কটা কী।

(হাকিকাতুল ওহী পৃষ্ঠা : ১৮, ১৯, রুহানী খাযায়েন ২২তম খণ্ড পৃষ্ঠা : ২১)

তিনি (আঃ) আরও বলেন, لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ অর্থাৎ হে মহম্মদ (সাঃ) তাদের ঈমান না আনার কারণে তুমি কি এই দুঃখে নিজের আত্মাকে ধ্বংস করে ফেলবে? এই আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, আঁ হযরত (সাঃ) কাফেরদের ঈমান আনার জন্য এরূপ বিগলিত চিত্তে দোয়া করতেন যে, ভয় ছিল আঁ হযরত (সাঃ) এই দুঃখে নিজ প্রাণ বিনাষ করে না বসে। এই জন্য আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, তাদের জন্য এভাবে শোক প্রকাশ করো না, এভাবে নিজের অন্তরকে বেদনার লক্ষ্যস্থল বানিও না। কেননা, তারা ঈমানের ভ্রুক্ষেপ করে না এভং তাদের উদ্দেশ্য ও চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

(যমিমা, বারাহীনে আহমদীয়া ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৬২)

এখানে এটি প্রকাশ থাকা আবশ্যক যে, অনেক সময় আমাদের ভাই এবং বোনেরা হুজুরের নিকট নিজের কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দোয়ার আবেদন করে থাকে এবং সেই দোয়া তাদের ইচ্ছানুযায়ী পূরণ হয় না, এমন লোকদের জন্য বলতে চাই যে, তাদের উচিত হুজুরের নিকট দোয়ার আবেদন করতে থাকা এবং নিজেও দোয়ার বিগলিত চিত্তে দোয়া করতে থাকা। তারপরে বিষয়টা আল্লাহ তা'লার নিকট ছেড়ে দেওয়া, আর আল্লাহ তা'লা যিনি আমাদের সকলের প্রিয় তাকে উদ্দেশ্য করে এই দোয়া করা উচিত যে, হে আমাদের দোয়া গ্রহণকারী খোদা তোমার পক্ষ হতে কোন দুঃখ কষ্ট অথবা তোমার কৃপা মোটকথা যাই হোক না কেন আমার সন্তুষ্টি ওতেই যাতে তুমি সন্তুষ্ট।

প্রিয় শ্রোতামণ্ডলী! এই পৃথিবীর সকল ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তা'লার আদেশে চলছে। বাতাস এবং অগ্নি ও বৃষ্টি সব কিছুই আল্লাতা'লার আদেশে চলছে। কোন জাতি এবং এলাকার জন্য বৃষ্টি বর্ষণ রহমত হয়ে দাঁড়ায় আর কারোর জন্য নূহের জাতির ন্যায় আযাব হয়ে যায়, আল্লাহ তা'লার আদেশে বাতাস প্রবাহিত এবং স্তব্ধ হয়ে যায়। পৃথিবীর কোন শক্তি বায়ু, অগ্নি ও বৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখে না। বড় বড় শক্তিশালী দেশে ধ্বংসের প্লাবন ও ঝড় আসে, তাদের সম্মুখে সমস্ত জাগতিক পরাশক্তি ও তাদের সমস্ত ব্যবস্থাপনা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।

অনেক সময় জামাতে আহমদীয়াকেও এই সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখিন হতে হয়। আর ব্যবস্থাপকগণ এটা ভেবে নেয় যে, বৃষ্টি এবং ঝড়ের জন্য ওদের জামাতীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে না। এই রকম অবস্থায় তারা ওদের প্রিয় ইমাম হযরত খলিফাতুল মসীহ আল-খামিস (আই.)-এর নিকট নিজেদের ব্যাকুলতার কথা প্রকাশ করে দোয়ার আবেদন জানান। আর হুজুর (আই.)-এর প্রার্থনাকে আল্লাহ তা'লা গ্রহণ করে নেন। আর সেই সমস্ত ঝড় ও বৃষ্টি জামাতে আহমদীয়ার অনুষ্ঠানকে বাধাগ্রস্থ হওয়া থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহ্ তা'লা ঐ সমস্ত ঝড়কে এইভাবে আদেশ করেন যেভাবে তিনি আগুনকে আদেশ দিয়েছিলেন, যার মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। হে আগুন তুমি শীতল হয়ে যাও এবং ওর (ইব্রাহীম) জন্য শান্তির উৎস হয়ে যাও।

ঝড় ও বৃষ্টি সম্বন্ধে হুজুর (আই.)-এর দোয়া গ্রহণীয়তার কিছু ঘটনা উপস্থাপন করা হচ্ছে।

১) ২০০৪ সালে আফ্রিকা ভ্রমণে যখন হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আই.) নাইজেরিয়া থেকে বেনিন ও আসরের সময় মিশনে পৌঁছলেন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল, নামাজের জন্য আঙিনাতে চারিদিকে খোলা জায়গার ব্যবস্থা ছিল। বৃষ্টির জন্য ঐ জায়গায় নামাজ পড়া দুষ্কর হয়ে গিয়েছিল, এমনকি দাঁড়ানোও মুশকিল ছিল।

হুজুর বাইরে বের হলেন আর নামাজ পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন আমির সাহেব বললেন এই সময় তো প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। আর নামাজের জন্য আঙিনাতে ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু বৃষ্টির জন্য সমস্যা হচ্ছে। হুজুর আনোয়ার (আই.) আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন দশ মিনিট পরে নামাজ পড়া হবে। তারপর হুজুর আনোয়ার ভিতরে প্রবেশ করলেন। কেবল দুই তিন মিনিট হয়েছে- হঠাৎ বৃষ্টি থেমে যায়, আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। আর দেখতে দেখতে রৌদ্র বেরিয়ে এল আর ঐ আঙিনাতে নামাজের ব্যবস্থা হয়ে গেল। স্থানীয় বাসীন্দরা ঐ নিদর্শন দেখে আশ্চর্য হলেন, তাদের

যুগ ইমামের বাণী

সুতরাং তোমরা সর্বদা সচেষ্ট থাক যেন কুরআন শরীফের এক বিন্দু-বিষর্গও তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দেয় এবং সেই জন্য যেন তোমরা ধৃত না হও। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ৪৪)

দোয়া প্রার্থী আব্দুর রহমান খান, জেনারেল ম্যানেজার (Lily Hotel) গৌহাটি

বক্তব্য ছিল এই এলাকায় বৃষ্টি শুরু হলে তা অনেক ঘন্টা ধরে তা চলতে থাকে। হুজুর আনোয়ার দশ মিনিটের কথা বললেন, কিন্তু তিন মিনিটের মধ্যেই থেমে গেল। আর শুধু বৃষ্টি থেমে যায় নি বরং মেঘ ও অদৃশ্য হয়ে গেল।

২) অনুরূপভাবে কানাডা ভ্রমণের সময় যখন KILGIRI মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করার ছিল তার একদিন পূর্বে কানাডার আমির সাহেব হুজুর আনোয়ারের নিকট আবেদন করেন যে, আবহাওয়া দপ্তরের থেকে খবর পাওয়া গেছে যে, আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ থাকবে। প্রচুর পরিমাণে ঝড় বৃষ্টির ও খবর আছে। আর আগামী কাল প্রাতে মসজিদের উদ্বোধন আছে, মেহমানরাও আসছে। আমির সাহেব হুজুরের নিকট দোয়ার আবেদন জানালেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে হুজুর আনোয়ার (আই.) কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকলেন এবং তারপর বললেন- "আমরা যে মসজিদের ভীত রচনা করতে যাচ্ছি সেটা খোদারই ঘর। আর আবহাওয়া ও খোদার হস্তগত সেজন্য ওটা খোদার উপর ছেড়ে দাও আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহ করবেন।

সুতরাং পরদিন সকালে বৃষ্টির কোন নাম ও নিশানা ছিল না, খুবই সুন্দর আবহাওয়া ছিল। ভিত্তি স্থাপনার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে গেল। প্রায় দুই ঘন্টার অনুষ্ঠান ছিল। অনুষ্ঠান শেষ করে যখন হুজুর আনোয়ার যখন গাড়িতে বসলেন গাড়ির দরজা বন্ধ করার সাথে সাথে হঠাৎ প্রচণ্ড বৃষ্টি সহ দমকা জড় বইতে লাগল। এইভাবে তিন চার ঘন্টা একই ভাবে অব্যাহত থাকল। এটা একটা নিদর্শন ছিল, যা হুজুর আনোয়ারের দোয়ার মাধ্যমে প্রকাশ হয়েছিল। আর প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তর এই নিদর্শনকে দেখে আল্লাহর দরবারে সেজদা করতে লেগেছিল।

(আল ফযল দোয়া নম্বর- ২৮, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃষ্ঠা : ৪৩-৪৫)

৩) কিছু অসুবিধার কারণে ২০০৮ সালের কাদিয়ানের জলসা ডিসেম্বর মাসে নির্দিষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত হয়নি বরং বরং ২৫, ২৬ ও ২৭ মে ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শেষ দিনে হুজুর আনোয়ারের সমাপ্তি ভাষণ ছিল। যে মাসে পাঞ্জাবে ধূলি হওয়া ও ঘূর্ণি ঝড় হয় সমাপ্তি অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার মুহূর্তে ঘূর্ণি ঝড় শুরু হয়ে গেল আবহাওয়া দফতর তীব্র ঠাণ্ডা বায়ু ও বৃষ্টি হওয়ার সতর্ক বার্তা দিয়েছিল। জলসা গাহতে আহমদী ছাড়া হিন্দু, শিখ, ঈসায়ী বন্ধুরা হুজুর (আই.)-এর বক্তব্য শোনার জন্য একত্রিত ছিল এদিকে আঁধি তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল এমন মনে হচ্ছিল জলসার মাঠের সমস্ত জিনিসপত্র উড়িয়ে নিয়ে যাবে। সব চেয়ে বেশি ভয় হচ্ছিল বিদ্যুৎ এবং এম. টি. এ সংযোগ বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। হুজুর আনোয়ার (আই.)-এর সমস্ত পরিস্থিতি লিখিতভাবে আবহাওয়া ঠিক হওয়ার জন্য দোয়ার আবেদন করা হল। তেলাওয়াত ও নজম পাঠের পর হুজুর (আই.) তাঁর বক্তব্যের শুরুতে বলেন-কাদিয়ান থেকে সংবাদ পাওয়া গেল যে, এখন ওখানে প্রচণ্ড ঝড় বইছে, দোয়া করুন স্বাভাবিক ভাবে জলসা যেন সম্পন্ন হয়। আল্লাহ্ তা'লা হুজুর (আই.)-এর এই দোয়া কবুল করলেন এবং দুই তিন মিনিটের মধ্যে ঝড় থেমে গেল। আবহাওয়া যে উত্তপ্ত ছিল স্বাভাবিক হল আর শ্রোতাগণ খুবই শান্তিপূর্ণ ভাবে হুজুর (আই.)-এর বক্তব্য শ্রবণ করলেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লারই। নিজেদের লোক ছাড়া হিন্দু, শিখ ভাইরা ও হুজুরের দোয়া কবুলিয়তের একটি নিদর্শনের সমর্থন করলেন।

৪) হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল-খামিস (আই.)-এর দোয়া কবুল হওয়ার একটি ঈমান বর্দ্ধক ঘটনা যা ঘানার সঙ্গে জড়িত।

হুজুর আনোয়ার (আই.) ২০০৪ সনে যখন ঘানায় গিয়েছিলেন সেই সফরে কোন এক সময় হুজুর ঘানা বাসীদের উদ্দেশ্যে সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, ঘানার মাটি থেকে তেল হবে। সুতরাং ২০০৮ সালে খিলাফত জুবিলির প্রাক্কালে দ্বিতীয়বার ঘানা পৌঁছলেন তখন ঘানার রাষ্ট্রপতি সাক্ষাতের সময় হুজুর কে বললেন, আমাদের দেশের জন্য হুজুরের দোয়া কবুল হতে চলেছে। হুজুর তাঁর বিগত সফরে বলেছিলেন - ঘানার মাটিতে তেল আছে। আর এখান থেকে তেল নির্গত হবে। হুজুর আনোয়ার (আই.)-এর এই দোয়া খুবই মর্যাদার সহিত পুরো হয়। আর গত বছর গত বছর ঘানা থেকে তেল বের হল।

সুতরাং এই ব্যাপারে ঘানার রাষ্ট্রীয় সংবাদপত্র Daily Graphic 17 April 2008 এর প্রথম পৃষ্ঠাতে হুজুর এবং ঘানার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় - "খলিফাতুল মসীহ্ তাঁর ২০০৪ সালের ঘানা সফরে ঘানাতে তেল আবিষ্কারের ব্যাপারে দৃঢ়তার সহিত নিজ বিশ্বাস ব্যক্ত করেন। এই দৃঢ় বিশ্বাস বিগত বছর সত্যতায় পরিবর্তিত হয় আর ঘানার মাটিতে তেল উৎপন্ন শুরু হয়।

(আল ফযল দোয়া নম্বর- ২৮, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃষ্ঠা : ৪৩-৪৫)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন :

"যদি মৃত জীবিত হয় তাহলে দোয়ার মাধ্যমে সম্ভব হয়, আর যদি বন্দী মুক্তি পেতে পারে তাও দোয়ার মাধ্যমেই সম্ভব।"

(লেকচার শিয়ালকোট, রুহানী খাযায়েন ২০তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৩৪)

প্রিয় শ্রোতামণ্ডলী! আল্লাহ্ তা'লা হুজুর (আই.)-এর দোয়ার ফলে আল্লাহর পথে বন্দীদের মুক্তির মাধ্যম হয়ে যায়। এই ব্যাপারে একটি ঘটনা উপস্থাপন করছি ।

মোজাফফর আলসাঈদ নামের এক বন্ধু তিউনস্ এর বাসীন্দা ছিলেন তিনি ধর্মীয় ধারনা রাখার কারণে তার প্রতি সন্ত্রাসবাদীর ধারা লাগিয়ে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বারংবার জেল তেকে ঢোকানো এবং বের করার ধারাবহিকতা চলতে থাকে। ইতি মধ্যে উনি জামাত সসম্বন্ধে অনেক কিছু শুনলেন এবং যাচাই বাছাই করার পরে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনলেন। অন্তিমবার যখন তাকে জেলে পাঠানো হল তখন তিনি অন্তর থেকে আহমদী হয়ে গিয়েছিলেন। সেই জন্য তিনি জেলে যাওয়ার সময় হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিসের নিকট চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। যদিও অপবাদ খুবই কঠিন তবুও আপনি দোয়া করুন যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন কেবল নিজ অনুগ্রহের মাধ্যমে মুক্তির ব্যবস্থা করে দেয়।

খোদাতালার শক্তি দেখুন মাত্র সাত সপ্তাহ পরে তিউন্সে এমন পরিবর্তন এল যে, তিউন্সের রাষ্ট্রপতি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই পরিস্থিতিতে সমস্ত বন্দীরা অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। তহাদের উপর জেলরক্ষী বাহিনী নির্মমভাবে গুলিবর্ষণ করে। এই পরিস্থিতি আট ঘন্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। যার ফলশ্রুতিতে শতাধিক বন্দী মারা যায়। মোজাফফর শঈদ সাহেব বলেন : "ঐ রাত আমার জেলে থাকা কেয়ামতের থেকে কম ছিল না। সকাল হওয়ার পর প্রহরীরা জেলের দরজা খুলে দিল, আর জীবিতদেরকে বলে দিল তোমরা স্বাধীন।

তিন মাস পরে দেশের পরিস্থিতি একদম পাল্টে যায়। আর একটি সরকারী আদেশানুসারে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার ঘোষণা করা হল। কেবল খোদার ফজলে আমিও নির্ভয়ে স্বাধীনভাবে মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম। কারো মধ্যে এই ধারনা জাগ্রত হতে পারে যে, আমার ছাড়পত্র এবং স্বাধীনতা হয়ত দেশের পরিবর্তনের কারণে হয়েছে। কিন্তু আমার ধারনা এর থেকে ভিন্ন। আমি পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে, আমার মুক্তি হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ)-এর দোয়ার মাধ্যমে হয়েছে। আমি গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যাওয়ার সময় হুজুরের নিকট দোয়ার চিঠি লিখেছিরোম। এমতাবস্থায় একদিকে জেলের মধ্যে নির্মম ভাবে ফায়ারিং থেকে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে আশ্চর্য জনক ভাবে বাঁচিয়েছেন। এমনকি জেলেরে দরজাও খুলে গেল। ছাড় পাওয়ার পরে যখন আমি বাড়ি পৌঁছলাম সেখানে হুজুরের কাছে পাঠানো চিঠির উত্তর এসেছিল। আমি খুলে পড়ে দেখলাম হুজুর আনোয়ার লিখেছিলেন আল্লাহ্ তা'লা আশ্চর্যজনকভাবে মুক্তি দিক। এই চিঠিটা পড়তেই আমার বিশ্বাস হয়ে গেল আমার মুক্তি যুগ খলিফার দোয়া কবুল হওয়ার জন্য হয়েছে। অন্য কোন কারণে নয়।

প্রিয় শ্রোতামণ্ডলী! চান্দ্র মাস ও বছরকে ইসলাম ধর্মের মাঝে এক মর্যাদা রয়েছে। চান্দ্র মাসের দিক থেকে চতুর্দশ শতাব্দী হিজরীর ২৬তম বছরে পবিত্র কোরআন ও হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ইন্তেকালের পর কাদিয়ানের ভূমিতে ২৫ রবিউসসানী, ১৩২৬ হিজরী কামরী সালে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খিলাফতের সূচনা হয়েছিল। ১৪২৬ হিজরী কামরী সালে এই মহান ঐতিহাসিক ঘটনার প্রথম শতাব্দী অতিবাহিত হতে যাচ্ছিল, সুতরাং ১৪২৬ অর্থাৎ ২০০৫ সালের প্রারম্ভে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল-খামিস (আই.) স্বয়ং কাদিয়ানের জলসায় অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন এবং প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাদিয়ানে হুজুর আনোয়ার এর একমাস অতিবাহিত করা নির্ধারিত ছিল। হুজুর আনোয়ার এই উপদেশ দিয়েছিলেন যে, সসমস্ত খোতবা ও খেতাব সরাসরি কাদিয়ান থেকে এম. টি. এর মাধ্যমে সম্প্রচারিত হবে। তখনও কিন্তু কাদিয়ান থেকে প্রোগ্রাম সরাসরি সম্প্রচার হওয়ার

কোন ব্যবস্থা প্রস্তুত ছিল না। এবং এই ব্যাপারে কেউ ভাবতেও পারেনি।

হুজুর আনোয়ার (আই.)-এর পক্ষ থেকে আগত উপদেশাবলী প্রাপ্ত হওয়ার পর জামাত আহমদীয়ার ব্যবস্থাপকগণ নতুন দিল্লির নিকট একটি বড় শহর নয়ডায় টিভি ব্রডকাস্টিং কম্পানির সাথে প্রোগ্রাম সম্প্রচারের ব্যাপারে চুক্তিপত্র তো হয়ে যায় কিন্তু এটি ব্রডকাস্টিং মিনিস্ট্রির নির্দেশ ছাড়া সম্ভব ছিল না। এবং তার জন্য ২০০৫ সালের জুলাই মাসেই আবেদন পত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অপেক্ষা করতে করতে ছয় মাসের অধিক সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, কিন্তু আসার কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। অবশেষে হুজুর আনোয়ার কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে লন্ডন থেকে দিল্লিতে পৌঁছে গেলেন এবং ২০০৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর তারিখে হুজুর আনোয়ার (আই.)-এর দিল্লি থেকে কাদিয়ান রওয়ানার তারিখ নির্ধারিত ছিল। অপরদিকে তকনও পর্যন্ত ব্রডকাস্টিং মিনিস্ট্রির নিকট হতে অনুমতির কোন খবর ছিল না। এমতাবস্থায় এই সমসস্ত পরিস্থিতি হুজুর আনোয়ার এর নিকট উপস্থাপন করা হয়। হুজুর আনোয়ার (আই.) কাদিয়ান আগমনের একদিন পূর্বে বলেন যে, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কাদিয়ানে যাব না যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রোগ্রাম সরাসরি সম্প্রচারের অনুমতি এসে যায়।

আল্লাহ তা'লা, যিনি বাদশাহদের বাদশাহ ও সর্বশক্তিমান সে হুজুর আনোয়ার (আই.)-এর দোয়া গ্রহণ করেন এবং এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে দেন সেদিন বিকাল ৫ঘটিকায় অনুমতি পত্র এসে যায় এবং প্রথম বার কাদিয়ান থেকে সমস্ত খোতবা ও খেতাব সরাসরি সম্প্রচারিত হয়ে যায়। অনুমতি দানকারীদের অন্তরে অনুমতি দেওয়ার তাহরিক সৃষ্টি করার কারো সাধ্য ছিল না। এটি শুধু মাত্র হুজুর আনোয়ার (আই.)-এর দোয়া ও আল্‌রাহ তা'লার কৃপার মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ॥

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ)-এর দোয়ার মাধ্যমে রোগীদের আরগ্যলাভ :

আল্লাহ তা'লা পবিত্র কোরআন মজীদের মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কথা উল্লেখ করেন : وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ যখন আমি অসুস্থ হই তখন ঐ আমাকে আরগ্য দান করে। পৃথিবীর চিকিৎসক এবং রোগ নির্ণয়নকারীরা তো ঔষদ দিতে পারে কিন্তু আরোগ্যদান তাদের এখতেয়ারে নেই। রোগমুক্তি কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সত্বায় নির্ধারিত। চিকিৎসকেরা অনেক সময় অনেক রোগদেরকে ফিরিয়ে দেয়, যার চিকিৎসা নেই বলে। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে আর হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল-খামিস (আইঃ)-এর দোয়ার কারণে সে আরোগ্য লাভ করেছে।

শ্রদ্ধেয় শ্রোতামণ্ডলী!

ফিলিস্তিনে উমর আবু আরকুব সাহেব বলেন - " পাঁচজন ডাক্তার তার রোগ নির্ণয় করে। আর তারা ক্যান্সার হওয়ার রিপোর্ট দেন। যা খাদ্যনালী থেকে শুরু করে ফুসফুস পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। আর ডাক্তারগণ বলেছেন তিন মাস পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে।

উমর আবু আরকুব সাহেব বলেন যে, যখন তার কন্যা এই ভয়াবহ রোগের কথা জানতে পারলো তখন সে মাননীয় শরীফ অওদাহ্ সাহেব যিনি কাবাবীর থেকে লন্ডনে গিয়েছিলেন টেলিফোনে যোগাযোগ করলো হুজুরের নিকট আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে দোয়ার আবেদন করল। আর প্রিয় খলিফা আমার আরোগ্যের জন্য দোয়া করলেন।

এদিকে চিকিৎসকেরা আমাকে জাহিরিয়া নামক জায়গায় ফিলিস্তিন থেকে আল কুদুস এর একটি ফ্রান্সি হাসপাতালে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে পাঠালেন। তিনি আবশ্যকীয় চেকাপ করালেন আর রিপোর্ট দেখার পরে বললেন আপনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেছেন। আর ক্যান্সারের কোন চিহ্নই অবশিষ্ট নেই।

উমর আবু আরকুব সাহেব বলেন - আল্লাহ তা'লা আমাদের নেতা খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ)-এর দোয়া আমার জন্য কবুল করেছেন। আর আমাকে পরিপূর্ণ ভাবে আরোগ্য দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ॥

আফ্রিকার নাইজেরে আমাদের একজন মুরুব্বী সাগীর আহমদ ক্বমর সাহেব ভীষণ অসুস্থ হয়েছিলেন। তাঁর ব্রেনের ক্লট আসার ফলে রোগের প্রকোপ এত বেড়ে গিয়েছিল যে, কোমা তে চলে গিয়েছিলেন। এই অবস্থায় তিন চার দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় রিপোর্ট প্রত্যহ হুজুর আনোয়ার (আইঃ)-এর নিকট পাঠানো হত। হুজুর আনোয়ার তাঁর সম্পূর্ণ আরোগ্যের জন্য দোয়া করছিলেন। একদিন হুজুর আনোয়ার বলেন তাকে শীঘ্রই এক হোমিওপ্যাথি ঔষদ দেওয়া হোক। সুতরাং প্রতিবেশি দেশ বুরকিনাফাসো থেকে আমাদের একজন চিকিৎসক এই ঔষধ নিয়ে ওখানে পৌঁছালেন। আর নিজেই OBSERVATION WARD গিয়ে এই ঔষধ তার ঠোঁটে লাগিয়ে দিলেন।

ডাক্তারবাবু বলেন, যখন ঔষধ ওনার ঠোঁটে লাগানো হল তখন ওনার শরীর নড়ে উঠলো। কিছুক্ষণ পর চোখ খুললেন এবং পরদিন সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান ফিরলো এবং নিজে থেকে উঠে বসলেন। আলহামদুলিল্লাহ॥ যুগ খলিফার দোয়ার মাধ্যমে একজন মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে গেলেন।

মুসলমানদের সংখ্যা গরিষ্ঠ্য এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, বর্তমান যুগে আল্লাহ্ তা'লা দোয়া কবুল করে না। এমন বিশ্বাস যারা রাখে তাদের হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর দোয়ার মাধ্যমে আরোগ্যলাভকারীদের ঘটনা জানা দরকার। যে সমস্ত রোগীদের চিকিৎসকরা লা ইলাজ অর্থাৎ যার কোন চিকিৎসা নেই ঘোষণা করেছেন আর বলে দেন ইনি মাত্র কয়েক দিনের মেহমান। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর খলিফাদের দোয়া ওদের পক্ষে গ্রহণ করেন এবং এইভাবে মৃত ব্যক্তিদের জীবন দান করেন।

দোয়া গ্রহণের নির্দশন :

বুলগেরিয়ার একজন নবাগত নিষ্ঠাবান আহমদী ইটিম সাহেব নিজ পরিবার সহ জার্মানির বাৎসরিক জলসাতে অংশ গ্রহণ করেন। উনি কয়েক বছর পূর্বে ঈসায়ী ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। ওনার স্ত্রী তখনও বয়আত করেন নি, তাঁর বক্তব্য ছিল আমার তিনজন কন্যা সন্তান আছে, যদি আমার পুত্র সন্তান হয় তাহলে আমি আহমদী হয়ে যাব। উনি (স্ত্রী) হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আই.)-এর নিকট দোয়ার জন্য লেখেন। পরবর্তী বছর যখন দ্বিতীয় বার জলসাতে আসেন তখন সাত মাসের গর্ভবতী ছিলেন। সাক্ষাতের সময় তিনি বাচ্চার নাম রাখার জন্য আবেদন করেন। হুজুর আনোয়ার কেবল পুত্র সন্তানের নাম দেন "জাহিদ"।

জলসা সালানা থেকে ফেরত আসার পর তিনি মুরুব্বী সাহেবকে বলেন চিকিৎসকগণ বলেছেন কন্যা সন্তান আছে। সেজন্য আপনি দ্বিতীয় বার হুজুরের নিকট কন্যা সন্তানের নামের জন্য আবেদন করুন।

তখন মুরুব্বী সাহেব বলেন আপনি তো বলেছেন "যদি পুত্র সন্তান হয় তাহলে আহমদী হয়ে যাব"। আর হুজুর আনোয়ার কেবলমাত্র পুত্রের নাম নির্বাচন করেছেন। সেজন্য ইনশা আল্লাহ্ তা'লা পুত্রই হবে। চিকিৎসক যা ইচ্ছা বলুক তাদের মেশিন যা ইচ্ছা প্রকাশ করুক, এখন আপনার পুত্রই হবে। কেননা, খলিফাতুল মসীহ্ পুত্রের নাম দিয়েছেন। এই কথা শুনে তিনি বলতে থাকেন আমি তো পূর্বেই আহমদী হয়ে গেছি।

সুতরাং যখন সন্তান ভূমিষ্ট হল আল্লাহ্ তা'লা ওনাকে পুত্র সন্তানই দিলেন। তিনি জলসা সালানার প্রাক্কালে সেই পুত্র সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। আর সবাইকে বলে বেড়িয়েছিলেন দেখ, এই (সন্তান) যুগ খলিফার দোয়া কবুল হওয়ার নিদর্শন।

(আল ফযল দোয়া নাম্বার-২৮, ডিসেম্বর ২০১৫,পৃষ্ঠা : ৪৩-৪৫)

শ্রদ্ধেয় শ্রোতামণ্ডলী! দেশ বিভাগের সময় পূর্ব পাঞ্জাব থেকে আহমদী জামাতের অধিকাংশ মানুষকেই পশ্চিম পাঞ্জাবে হিজরত করতে হয়েছিল। যেজন্য পূর্ব পাঞ্জাবে অবস্থিত জামাতের অধিকাংশ পবিত্র এবং ঐতিহাসিক স্থান আহমদীদের বাসস্থান থেকে অস্থায়ীরূপে খালি হয়ে যায়। এই গুলির মধ্যে একটি হল লুধিয়ানার দারউল বয়আত। এটি সেই ঐতিহাসিক পবিত্র স্থান যেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ২৩ মার্চ ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে আহমদী জামাতের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। এই ঐতিহাসিক গৃহ সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার নেতৃত্বে ছিল এবং আছে। অথচ যখন ওখানে কোন আহমদী ছিল না তবুও এই ঘর খালি ছিল। কিছু কাল পরে একজন অমুসলমান তার অনুরোধ দারউল বয়আত যৎসামান্য ভাড়া বাবত থাকার জন্য এই শর্তে দেওয়া হয়েছিল যে, উনি ওনার নিজের বাসস্থান খুব শীঘ্রই অন্য কোন জায়গাতে ব্যবস্থা করে নেবে। আর দারউল বয়আতকে খালি করে জামাতের অধিনস্থ করে দেবে। তিনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করলেন এবং এমনটি করলেন না, সময় অতিবাহিত হতে থাকল। অবশেষে বাধ্য হয়ে ঘর খালি করার জন্য সদর আঞ্জুমান আহমদীয়াকে আদালতের সাহায্য

এরপর ২২ পৃ:

“যুগের প্রয়োজন ও ঐশী সাহায্যের আলোকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার নিদর্শন”

মূল উর্দু: মনসুর আহমদ মসরূর, সম্পাদক বদর (উর্দু), অনুবাদ- আজিবুর রহমান, মুবাল্লিগ সিলসিলা

মাননীয় সভাপতি ও বিশিষ্ট শ্রোতাগণ,

আস্সালো আলাইকুম ওয়া রহ্মাতুল্লা ওয়া বারাকাতুহু

যেমনটি আপনারা শুনেছেন আমার বক্তৃতার বিষয়বস্তু হল, **“যুগের প্রয়োজন ও ঐশী সাহায্যের আলোতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার নিদর্শন”**

আমি এই মুহূর্তে বক্তৃতার প্রথম অংশ সময়ের চাহিদা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। সম্মানীয় শ্রোতাবৃন্দ! ১৪০০ শতাব্দীটি ইসলামের জন্য এমনই বিপদের সময় ছিল যার উদাহরণ আমরা অন্য কোথাও পাই না। এ সময় ইসলামকে দু’দিক থেকে বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। একটি আভ্যন্তরীন বিপদ যে, মুসলমানরা ইসলাম হতে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। আর অন্যটি বাহির হইতে যে, অন্যান্য ধর্মবলম্বীরা ইসলামের উপর চরম আক্রমণ হানছিল। আভ্যন্তরীণ বিষয়ে বলতে গেলে বলতে হবে- মুসলমানদের ঈমান ও আমল দু’টিই বরবাদ হয়ে গিয়েছিল। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতের দূরতম সম্পর্কটুকুও ছিল না। কোরআনকেই একেবারেই পরিত্যাগ করেছিল। লক্ষ লক্ষ এমন আছেন যারা কলেমাটুকুও জানে না। বিশ্বাসের এমন অবস্থা হয়েছিল যে, আল্লাহতা’লার রসূল ফরিশ্তা এবং কোরআন করীম সম্পর্কে এমন সব বিশ্বাস আবিষ্কার করেছিল যে, ইসলামের স্বরূপ বিকৃত হয়ে গেছে। আলেমগণ ইসলামের ভীতকে দুর্বল করার কাজ করছে। সাধারণ মুসলমানরা পশুর মত হয়ে গেছে সম্পদশালীরা আরাম পিয়াসী ও শাসকগণ খেয়ানত করতে লেগেছে। সুন্দর চরিত্র যা মুসলমানদের একটি আলাদা পরিচয় ছিল, বর্তমানে তা থেকে অনেক দূরে চলে গেছে।

“আজকের দিনে বিষয় এটি নয় যে, মুসলমানরা ইসলামের কোন আদেশকে পরিত্যাগ করেছে, বিষয় হল তারা কোনটি অবলম্বন করে চলছে।” (দাওয়াতুল আমীর)

আর যদি বহিরাগত আক্রমণের কথা বলতে হয় তাহলে বলতে হবে ইসলাম সকল দিক থেকে অভিযুক্ত হচ্ছে। কারণ হল লক্ষ লক্ষ অভিযোগ ইসলামের উপর হচ্ছে। কোটি কোটি পুস্তক ইসলামের বিরুদ্ধে....ছাপা হচ্ছে। মুসলিম দেশগুলি একে অপরের সাথে বিরোধে লিপ্ত এর সঙ্গে নিজেদের দেশগুলিও আভ্যন্তরীণভাবে ফিতনা ফাসাদে লিপ্ত। দেশের বাসীন্দাগণ শাসকের বিরোধী আর শাসকগণও জনগণের রক্ত পিপাসূ হয়ে গেছে।

আমাদের প্রিয় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করেছেন :

“হে সত্যানুসন্ধানকারীগণ! ভেবে দেখবে এটা কি সেই সময় নয় যখন ইসলামের জন্য ঐশী সাহায্যের প্রয়োজন ছিল..... .....। তোমরা কি এখনও পর্যন্ত খবর পাওনি যে, কোন কোন ধরনের বিপদ ইসলামকে গ্রাস করছে, কত মানুষ ইসলাম ত্যাগ করেছে, কতজন ইসায়ী হয়ে গেছে, কতজন নাস্তিক হয়ে গেছে, আর কীভাবে শির্ক বিদাত একত্ববাদ ও সুন্নতের জায়গা নিয়েছে, ইসলামকে অস্বীকার করে কত বই পুস্তক লেখা হয়েছে এবং পৃথিবীতে তা বিতরণ করা হয়েছে। তোমরা সকলে ভেবে চিন্তে উত্তর দাও যে, এর প্রয়োজন ছিল না যে, আল্লাহতা’লা এই শতাব্দীতে এমন একজন কে পাঠাতেন যিনি বহিরাগত আক্রমণকে প্রতিহত করতেন। মাথা তুলে দেখ! ইসলামকে কীভাবে বিপদ গ্রাস করে নিয়েছে। ইসলামকে কীভাবে বিরোধীরা চারিদিক থেকে তির বর্ষণ করছে। কীভাবে কোটি কোটি মানুষ এই বিষ দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে।”

এইভাবে জ্ঞানের অগ্রগতি, বুদ্ধির বিকাশ, দর্শনের অগ্রগতি, নষ্টামীতে অগ্রগতি লোভ-লালসার অগ্রগতি, নাস্তিকতার অগ্রগতি, শির্ক বিদাতের অগ্রগতি এই সকল ব্যাপারে ঝড়ের গতিতে অগ্রগতিকে চোখ খুলে দেখুন। আর যদি ক্ষমতা থাকে ঝড়ের গতিতে এতসব ব্যাপারে অগ্রগতির সূর্যের কোন উদাহরণ উপস্থাপন করে দেখাও।

সম্মানীয় শ্রোতাবৃন্দ!

ইসলামের এই দারুন প্রয়োজনের দিনে দরকার ছিল যে, মুসলমানদের পথ-প্রদর্শন ও পরামর্শের জন্য ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ) আগমন করতেন। যার আগমনের সুসংবাদ মহানবী (সাঃ) এই ভাষায় দিয়েছিলেন যে, “মুসলমানগণ! তোমরা কতই না খুশি হবে যখন মরিয়ম পুত্র ঈসা তোমাদের মধ্যে অবতরণ করবেন। আর যার দ্বারা পৃথিবী ব্যাপি ইসলামের বিজয়ের সুসংবাদ আল্লাহ্ ও মহানবী (সাঃ) নিজের উম্মতকে দিয়েছেন। প্রত্যেক মুসলমান গুনিগণ এই বিষয়ে একমত ছিলেন যে, মসীহ্ ও মাওউদ ‘চোদ্দ শ’ শতাব্দীতে আগমন করবেন। অতএব আল্লাহ্ ওতাঁর রসূলের ভবিষ্যদ্বাণী এবং ইসলামের গুনি ব্যক্তিদের স্বপ্নানুযায়ী।

ঠিক চোদ্দ শ’ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রয়োজনের সময় আল্লাহ্তা’লা উম্মতে মোহাম্মাদীয়ার উপর রহম ও করম করার মাধ্যমে হযরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) কে ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ করে পাঠালেন।

তিনি (আঃ) বর্ণনা করছেন :

“ এমন সময়ে আমি আগমন করেছি যখন ইসলামী বিশ্বাস বিতর্কে ভরে গিয়েছিল। কোন নিয়মই বিতর্ক থেকে খালি ছিল না। আমার প্রয়োজন ছিল না যে, আমি নিজের সত্যতার অন্য কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতাম কেননা, প্রয়েজন নিজেই একটা প্রমাণ।

(জরুরতুল ইমাম, রুহানী খাযায়েন, ১৩ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪৯৫)

আমি ঐ সকল ব্যক্তির জন্য প্রেরিত হয়েছি যারা পৃথিবীতে বসবাস করছে তা সে এশিয়াতেই হোক আর ইউরোপেই হোক বা আমেরিকাতে।

(তরিয়কুল কুলুব, রুহানী খাযায়েন, ১৫ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫১৫)

শুধু এটাই যে, আমি এই সময়ের মানুষদের নিজের দিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বরং সময় আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। (পয়গামে সুলাহ্, রুহানী খাযায়েন, ২৩ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪৮৬)

যদি মু’মিন হও তাহলে শুকরিয়া জ্ঞাপন করো এবং সেজদাবনত হয়ে শুকরিয়া জ্ঞাপন করো। স্মরণ রাখো যে, সময়ের অপেক্ষা করতে করতে তোমার পূর্বপুরুষগণ গত হয়ে গেছেন এবং অগনিত আত্মা এই ইচ্ছা মনে নিয়ে পৃথিবী ত্যাগ করেছেন। যে সময় তুমি পেয়েছো এখন তার মর্যাদা রক্ষা করা না করা, উপকৃত হওয়া না হওয়া তোমাদের হাতে আছে। আমি বিষয়টি বারংবার উপস্থাপন করবো আমি এথেকে বিরত থাকবো না যে, আমি সেই ব্যক্তি যাকে সঠিক সময়ে সংশোধনের জন্য পাঠানো হয়েছে, যাতে ধর্মকে নতুনভাবে মনে জাগিয়ে তোলা যায়।

(ফাতে ইসলাম, রুহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৮)

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ!

এখন আমি আমার বক্তৃতার অন্য অংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর সত্যতা ঐশী সাহায্যের আলোতে। যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর বয়স চল্লিশ বছরের কাছাকাছি ছিল তখন আল্লাহতা’লা ইলহামের মাধ্যমে তাঁকে অবহিত করেছিলেন আলায়সাল্লাহু বেকাফিন আবদুহু (আল্লাহ্ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়) ঐশী সাহায্যে এটি প্রথম ইলহাম ছিল। এরপর ধারাবাহিকভাবে ঐশী সাহায্যের ইলহাম হয়, আল্লাহর পক্ষ থেকে জয়যুক্ত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। পরে সারাটা জীবন আল্লাহতা’লা নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অনেক বড় মর্যাদার সঙ্গে তাঁর সাহায্য করেন।

আমি এখানে অনেক ঐশী সাহায্যের মধ্যে একটির উল্লেখ করছি তা হল : “চন্দ্র সূর্য গ্রহণের নিদর্শন”। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, যখন আমাদের সত্য মাহদী দাবি করবেন তখন তার সত্যতার প্রমাণ হিসাবে আল্লাহতা’লা চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের মাধ্যমে তার সত্যতা প্রমাণ করবেন। চন্দ্র গ্রহণ তার নির্দ্ধারিত তারিখ গুলি মধ্যে প্রথম তারিখে লাগবে এবং সূর্য গ্রহণ লাগবে তার নির্ধারিত তারিখ গুলির মধ্যে মধ্যবর্তী তারিখে।

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ!

সৈয়্যেদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ১৮৮৯ সালে বয়আত গ্রহণের সূচনা করেন এবং আহ্মদীয়া জামাতের ভিত্তি স্থাপন করেন। তার ঠিক পাঁচ বছর পর ১৮৯৪ সালে আল্লাহ্ তাঁর সত্যতার প্রমাণ হিসাবে সূর্য-গ্রহণ ও চন্দ্র-গ্রহণ কে প্রকাশ করেন। ১৮৯৪

সালে এই নিদর্শন এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকাতে প্রকাশ পায় এবং পরবর্তী বছর ১৮৯৫ তে আমেরিকাতে প্রকাশ পায়।

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ!

সেই দিনগুলিতে মানুষ একথা বলতে শুরু করেছিল যে, মুসলমানরা বরবাদ হয়ে গেছে। চোদ্দ 'শ' সাল শুরু গেছে। এবার ইমাম মাহ্দী আবির্ভাব হবে। বাড়িতে বাড়িতে ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাবের সমালোচনা ছিল। যখন এই নিদর্শন প্রকাশ পেল শত শত লোক ইমাম মাহদীর জামাতের অন্তর্ভুক্ত হলেন। এক দিকে যেমন আহ্মদীদের মধ্যে এবং কাদিয়ানে উৎসবের পরিবেশ ছিল অন্যদিকে বিরুদ্ধবাদীদের অবস্থা বিরক্তিকর এবং বেদনাদায়ক ছিল। আলেমরা অপমানিত বোধ করছিলেন যে, মির্যা গোলাম আহ্মদ মসীহ্ ও মাহদীর দাবি নিয়ে বিদ্যমান, এমাবস্থায় সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের নিদর্শন পূর্ণ হয়ে গেছে। একজন ব্যক্তি একজন মৌলবীকে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের হাদিস সমূহ জিজ্ঞাসা করেন, মৌলবী বলেন : হাদিসটা ঠিকই কিন্তু তুমি যেন মির্যা সাহেবের জালে জড়িয়ে যেওনা। বিরোধী আলেমরা এটা ভেবে চিন্তিত ছিলেন যে, এবার লোক মির্যা সাহেবকে মেনে নেবে।

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাগণ!

বিরোধী আলেমদের কাছে এছাড়া আর কোন রাস্তা অবশিষ্ট ছিল না যে, হাদিসটির উপর সন্দেহ পোষণ করে এটিকে সন্দেহযুক্ত করা। একটি অভিযোগ তারা এটা করে যে, হাদিসটি দুর্বল।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করেছেন :

যদি কোন মর্যাদা সম্পন্ন হাদিস বিশারদের পুস্তক হতে এই হাদিসটির দুর্বল হওয়া প্রমাণ করতে পারো তাহলে তাকে এখনই এক শ' টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে। যেখানে চাও অর্থ আমানত হিসাবে জমা করাতে পারো। তা নাহলে আমার শত্রুতার জন্য সঠিক হাদিসকে যা আল্লাহ্ ওয়ালা আলেমদের লেখা তাকে বেঠিক বলা হতে বিরত থাকো। আল্লাহ্কে ভয় কর।

(তোহ্ফা গুলড়বিয়া, ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৩৩-১৩৪)

সম্মানীয় শ্রোতাবৃন্দ!

দ্বিতীয় অভিযোগ এটি করা করা হয়েছে যে, চন্দ্রগ্রহণ রমযানের প্রথম দিন হয় নি বরং ত্রয়োদশ রাতে হয়েছে। এবং সূর্যগ্রহণ রমযানের ১৫ তারিখে হয় নি বরং ২৮ তারিখে হয়েছে। এর উত্তরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন :

"পৃথিবী যখন থেকে সৃষ্টি হয়েছে চন্দ্র গ্রহণের জন্য তিনটি রাত খোদাতা'লা প্রাকৃতিক নিয়ম হিসাবে নির্দিষ্ট করেছেন অর্থাৎ ১৩, ১৪ ও ১৫ ..... এবং সূর্য গ্রহণের জন্য তিনটি দিন খোদাতা'লার প্রাকৃতিক নিয়মে নির্দিষ্ট। অর্থাৎ চান্দ্র মাসের ২৭, ২৮ ও ২৯ দিন।"

(হাকীকাতুল ওহী, ২২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২০৩)

সুতরাং চন্দ্র গ্রহণের প্রথম দিন ১৩ তারিখ মনে করা হয়। এবং সূর্য গ্রহণের মধ্যম দিন সর্বদা মাসের ২৮ তারিখ।

(তোহ্ফা গুলড়বিয়া, ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৩৩-১৩৪)

সম্মানীয় শ্রোতাবৃন্দ!

যেভাবে (জ্ঞানের পিতা) আবুল হাকাম (মূর্খের পিতা) আবু জেহেল হয়ে গিয়েছিল অনুরূপভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বিরোধীতার জন্য আল্লাহ্তা'লা আলেমগণকে মূর্খ বানিয়ে দিলেন। প্রথমে তারা প্রকৃতি বিরোধী দাবি করতে থাকে যে, চন্দ্রগ্রহণ তার নির্ধারিত দিনগুলির প্রথম দিন লাগতে হবে, দ্বিতীয়ত তারা হাদিসে উল্লিখিত শব্দ 'ক্বমর' (চাঁদ) -এর প্রতি খেয়াল করে নি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন হাদীসে "হেলালের" উল্লেখ নেই বরং "ক্বমরের)" উল্লেখ আছে। তিনদিন পর্যন্ত চাঁদকে হেলাল বলা হয়, তারপর তাকে ক্বমর বলা হয়।

তিনি বর্ণনা করেছেন : এটি এমন একটি বিষয় যেটিতে সকল আরব বাসীরা আজ পর্যন্ত সহমত পোষণ করেন। আরবী যাদের মাতৃভাষা তাদের কেউই এর বিরোধী বা এর অস্বীকারকারী নয়। যদি তোমার সন্দেহ থাকে "কামুল" "তাজুল উরুস" "সহা" একটি বড় পুস্তক "মসম্মা লিসান আরব" এভাবে সকল অভিধানের পুস্তক এবং আদব ও কবিগণের কবিতা, কাসিদাগারগণের কাসিদা মনোযোগ সহকারে দেখুন.....আমরা এক হাজার টাকা পুরস্কার তোমাকে দেবো, যদি তুমি এটি বেঠিক প্রমাণ করতে পারো। তা নাহলে তুমি মহানবী (সাঃ)-এর কালাম, জ্ঞানীদের জ্ঞানকে তার আসল অর্থ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেওনা। হে মিসকিন! আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সেই পূর্ণ মানবের মর্যাদা নিয়ে কোন প্রকার ধৃষ্টতা দেখিও না, যিনি আরব ও অনারবদের সকলের তুলনায় অধিক বাগ্মিষ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে সকলের চেয়ে বেশি খ্যাত .....তোমার কি হয়েছে যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সম্মানের প্রতি দৃষ্টি নেই!

(নুরুল হক, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৯৭)

সৈয়্যেদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করেছেন, যখন থেকে এই পৃথিবীর সৃষ্টি কোন নবীর দাবির স্বপক্ষে এই নিদর্শন দেখানো হয় নি। আর যদি কেউ এর বিরুদ্ধে প্রমাণ আনতে পারে তাকে এক হাজার টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করার কথা বলেছেন। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, তোমরা কি এর উদাহরণ পূর্বের সময় থেকে দেখাতে পারো? তাছাড়া কোন পুস্তকে পড়েছো যে, একজন দাবিকারকের দাবির স্বপক্ষে আল্লাহর পক্ষ হতে রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ লেগেছে। যেমনটি এবার তোমরা দেখলে। যদি জানা থাকা উল্লেখ কর তোমাকে হাজার হাজার টাকায় পুরস্কৃত করা হবে। যদি করে দেখাও তাহলে, তাই এমন প্রমাণ কর পুরস্কার নিয়ে যাও....আর যদি প্রমাণ না করতে পারো তা কখনোই পারবে না তাহলে সেই অগ্নিকে ভয় কর যেটি ফসাদকারীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

(নুরুল হক, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২১১)

শদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ! আমি আরও একটা ঐশী নিদর্শনকে ব্যাখ্যা করছি যা হলো ভবিষ্যদ্বাণী। আল্লাহ্তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে নিদর্শন ও মোযেযাতে ভরপুর ভবিষ্যদ্বাণী জানিয়েছেন। যেগুলি তাঁর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করেছেন :

"নবীদের নবীদের সত্যতার প্রমাণ হিসাবে মোযেযা ও ভবিষ্যদ্বাণী রেখেছেন। ভবিষ্যদ্বাণী সমতূল্য কোন নিদর্শন নেই। তাই আল্লাহ্তা'লার নিকট হতে প্রত্যাদিষ্টগণকে তাঁদের ভষ্যিদ্বাণী দ্বারা চিহ্নিত করা আবশ্যক।"

(লেকচার লুধিয়ানা, রুহানী খাযায়েন ২০তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৫৬)

আল্লাহতা'লা যরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে হাজার হাজার ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছেন তিনি নিজের 'তরিয়াকুল কুলুব' পুস্তকে ৭৫টি, 'নযুলে মসীহ্' পুস্তকে ১৫০টি, 'হাকীকাতুল ওহী' পুস্তকে ২০৮টি ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহ্তা'লার নিদর্শন এবং মো'যেযাকে ঐশী সাহায্যের উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করেছেন : "যদি আপনি আমার 'নযুলে মসীহ্' পুস্তকটি দেখেন তাহলে আপনি জানবেন যে, আল্লাহ্তা'লা নিদর্শন দেখাতে কম করেন নি। যেভাবে পৃথিবীর একটা বড় অংশ জলমগ্ন সেভাবেই এই সিলসিলা আল্লাহর নিদর্শনে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এমন কোন দিন অতিক্রান্ত হয় না কোন না কোন নিদর্শন প্রকাশ না পায়।"

(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, রুহানী খাযায়েন ২০তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪১১)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করেছেন : "আমি বলবো ঈমানদারের জন্য একটা নিদর্শনই যথেষ্ট। একটাতেই তার অন্তর কেঁপে যায়। কিন্তু এখানে একটি নয় বরং শত শত নিদর্শন বিদ্যমান বরং আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, পরিমাণটা এত বেশি যে, তার পরিসংখ্যান সম্ভব নয়।"

(লেকচার লুধিয়ানা, রুহানী খাযায়েন ২০খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৫৭)

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিদর্শনের পর নিদর্শন দেখিয়েছেন আর বিরোধীরা অস্বীকারের পর অস্বীকার করে গেছে। 'মুদ' এর বিতর্ক সভায় মৌলবী সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী বড় নির্লজ্জের মত এই মিথ্যা বলে যে, মির্যা সাহেবের সকল ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়াও সে আরও বহু মিথ্যা কথা এই সভায় বলে যার উত্তরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) পুস্তক 'এযায আহ্মদী' লেখেন। মৌলবী সানাউল্লাহর মিথ্যার উত্তরে তিনি লেখেন :

যদি (সানাউল্লাহ্) তিনি সত্যবাদী হন কাদিয়ানে এসে একটি ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণ করুন, আর প্রত্যেক প্রমাণের বদলে একশ' টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে। যাতায়াতের খরচ আলাদাভাবে দেওয়া হবে।"

(এযায আহ্মদী, রুহানী খাযায়েন ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১১৮)

বর্ণনা করেছেন : স্মরণ রাখবে যে, "আমি আল্লাহর নিকট হতে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে বলছি যদি সকল মৌলবী ও তাদের সহযোগী তাদের এলহামের দাবীদার একত্রিত হয়ে এলহামের বিষয়ে আমার সঙ্গে প্রতিযোগীতা করেন তাহলে আল্লাহতা'লা আমাকে জয়যুক্ত করবেন, কেননা আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে।"

(আনযামে আথম, রুহানী খাযায়েন ১১তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৪১)

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ!

আমি আরও একটি ঐশী সাহায্যের উল্লেখ করছি। তা হল

আল্লাহতা'লার পক্ষ হতে তাঁর কোরআনের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করেছেন : "আজ থেকে কুড়ি বছর পূর্বে বারাহীনে আহ্মদীয়া পুস্তকে উল্লেখ আছে : 'আর রহ্মান আল্লামাল কুরআন' এই এলহামের বাস্তবায়নে আল্লাহতা'লা আমাকে কোরআনের জ্ঞান দান করেছেন।.....আমাকে সত্যতায় ও নিকটবর্তীতায় সমুদ্রের মত ভরে দিয়েছেন। আর বারংবার এলহামের মাধ্যমে জ্ঞাত করেছেন যে, এ যুগে তোমার থেকে অধিক আল্লাহর নিকটবর্তী ও আল্লাহর প্রেম কাহাকেও দান করা হয় নি।"

(যরুরতুল ইমাম, রুহানী খাযায়েন ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫০২)

তিনি বর্ণনা করেছেন :

"আরও একটি ভষ্যিদ্বাণী নিদর্শন স্বরূপ, যেমন - "আর রহ্মান রহ্মান আল্লামাল কুরআন" এই আয়াতে আল্লাহ্ তাঁকে কোরআনের জ্ঞান দান করার ওয়াদা করেছিলেন। আল্লাহতা'লা এই ওয়াদাকে এভাবে পূর্ণতা দান করেছেন যে, এখন আর অন্য কাহারো কোরআনের জ্ঞানে তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগীতা ক্ষমতা দেন নি। আমি সত্য সত্য বলছি এখন এই প্রদেশের সকল মৌলবীদের মধ্যে কোন একজনও কোরআনের জ্ঞানের বিষয়ে আমার সঙ্গে প্রতিযোগীতা করতে চায় এভাবে যে কোন সূরার ব্যাখ্যা আমি করলাম আর সেই একই সূরার ব্যাখা কোন বিরোধী মৌলবী করেন (আমার ব্যাখ্যার তুলনায়) লজ্জিত হবেন আর প্রতিযোগীতায় ব্যর্থ হবেন। আর এটাই কারণ আমন্ত্রণ করা সত্ত্বেও কেউ এ ব্যাপারে উৎসাহ দেখায় নি। এভাবে এটি একটি জ্বলন্ত নিদর্শন, কিন্তু তাদের জন্য যারা বিচার ক্ষমতা সম্পন্ন ও বিশ্বাসী।"

(আনযামে আথম, রুহানী খাযায়েন ১১তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৯)

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ!

মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটলবী নিষ্ঠুর ও বিবেচনাহীনভাবে জনসাধারন্যে এর প্রচার চালাতে থাকে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কোরআনের জ্ঞান ও আরবী ভাষায় একবারে অজ্ঞ। জনসাধারণকে পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচাতে ও মহম্মদ হোসেন বাটালবীকে তার মিথ্যা প্রকাশ করতে তাকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কোরআনের ব্যাখ্যার প্রতিযোগীতায় আমন্ত্রণ জানান কিন্তু মহম্মদ হোসেন বাটালবী বিভিন্ন বাহানাবাজি ও অবান্তর শর্ত রেখে প্রতিযোগীতা থেকে পলায়ন করে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দ্বিতীয়বার তাকে আমন্ত্রণ জানায়। যাতে এই ঝগড়ার মীমাংসা হয়ে যায়। যে কারণে তিনি পুস্তক "কেরামত সাদেকীন" অল্প দিনের মধ্যে লিখে তা প্রকাশ করেছেন। যার মধ্যে সূরা ফাতেহার ব্যাখ্যা লেখেন এবং আঁ হযরত (সাঃ)-এর প্রশংসায় ৬৬১ টি পংক্তি কবিতার আকারে লেখেন। আর এর অন্য একটি নমুনা বানানোর জন্য মহম্মদ হোসেন বাটালবীকে বিশেষ করে এবং সকল মৌলবীদেরকে পুরো এক মাসের সময় দেন।

তিনি বর্ণনা করেছেন :

"যদি বিবেচকদের সাক্ষীতে এটা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, অন্য কাহারও কবিতা বা কোরআনের ব্যাখ্যা আমার কবিতা ও ব্যাখ্যার তুলনায় উৎকৃষ্ট তাহলে আমি নগদ এক হাজার টাকা সেই ব্যক্তিকে দিতে বাধ্য থাকব যিনি আমার পুস্তকটি প্রকাশনার একমাসের মধ্যে নিজের কবিতা ও ব্যাখা পুস্তকাকারে প্রকাশ করবে।"

(কেরামত সাদেকীন, রুহানী খাযায়েন ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪৯)

তিনি বর্ণনা করেছেন :

"সেই সকল মৌলবী যাদের মাথার মধ্যে অহংকারের পোকা বিদ্যমান, আর যারা আমাকে বার বার দাবির সত্ত্বেও কাফের ও মুরতাদ খেয়াল করেন এবং নিজেকে কিছু একটা মনে করেন এই প্রতিযোগীতায় আমন্ত্রিত থাকছেন। সে তিনি দিল্লিরই বাসিন্দা হোন বা লক্ষ্ণৌ এর অথবা লাহোরের বা অন্য কোন শহরের.....এবার এদর লজ্জা শরমের পরীক্ষা তারা যেন প্রতিযোগীতা করে আর অর্থ সংগ্রহ করে।"

(কেরামতে সাদেকীন, রুহানী খাযায়েন ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৬৩)

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ!

এরপর তিনি পীর মেহের আলী শাহ্ গোলোড়ভি কে বিশেষ করে ও সকল আলেমগণকে লাহোরের একটি জলসায় কোরআন মজীদের চল্লিশটি আয়াতের আরবীতে ব্যাখ্যার প্রতিযোগীতার জন্য আমন্ত্রণ জানান। মৌলবী পীর মেহের আলী সাহেব বিভিন্ন বাহানা করে করে পলায়ন করেন এবং জনসাধারণকে ঠকাতে চায় এটা বলে যে, সে প্রতিযোগীতার জন্য তৈরী ও প্রতিযোগীতা করতে পারে।

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ!

নবীদের কাজ বারংবার বিতর্কের সমাধান করে দেওয়া, যাতে যারা আল্লাহর রাস্তায় আসার যোগ্যতা রাখেন তারা সঠিক পথ খুঁজে পান। যে কারণে তিনি দ্বিতীয়বার সূরা ব্যাখ্যার প্রতিযোগীতার আমন্ত্রণ জানান। তিনি এই প্রতিযোগীতার জন্য ৭০ দিন সময় দেন যে, এই দিনের মধ্যে তোমরাও নিজেদের ঘরে বসে সূরা ফাতেহার ব্যাখ্যা প্রকাশ করো, আমিও প্রকাশ করি।

তিনি বর্ণনা করেন :

"তাদের অনুমতি আছে তারা এই কোরআনের ব্যাখ্যা প্রস্তুত করতে পৃথিবীর যেকোন মৌলবীর সাহায্য নিতে পারে। আরব থেকে বিশেষজ্ঞদের ডাকুক, লাহোর ও অন্যান্য শহরে কর্মরত আরবীর প্রফেসারদের সাহোয্যের জন্য ডাকতে পারেন। ১৫ই ডিসেম্বর ১৯০০ সাল হতে ৭০ দিনের মধ্যে আমাদের উভয়ের জন্য সময় আছে।.....আমার সঙ্গে প্রতিযোগীতায় কোরআনের ব্যাখ্যা লেখার পর আরবের তিনজন ভাষাবিদ যদি বিরোধদির ব্যাখ্যাতে আমার ব্যাখ্যার তুলনায় উত্তম আখ্যা দেন তাহলে ৫০০ টাকা নগদ দিয়ে দেব। এছাড়া আমার সমস্ত পুস্তক জ্বালিয়ে তাদের হাতে বয়আত করে নেব।

(আরবাঈন নম্বর ৪, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪৪৯)

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ!

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) "এযাযুল মসীহ্" ন্,ক পুস্তকাকারে আরবীতে সূরা ফাতেহার সুন্দর একটি তফসীর প্রকাশ করে দেন। কিন্তয পীর মেহের আলী সাহেবের কিছুই প্রকাশ করার সৌভাগ্য হয় নি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করেছেন :

"সুতরাং পীর সাহেবের নাম মেহের আলী নয় বরং 'মোহর' (স্টাম্প) আলী কারণ তার এই অপারগতা পুস্তক 'এযাযুল মসীহ্' এর সত্যতায় মোহর মেরে দিয়েছে।"

(নযুলুল মসীহ্, রুহানী খাযায়েন ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩২)

তিনি বর্ণনা করেছেন :

"আমি সেই খোদার কসম খেয়ে বলছি যার অধিনে আমার জান আছে, যে আমাকে কোরআনকে বোঝার ক্ষেত্রে সকল আত্মার উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আর যদি কোন মৌলবী আমার সঙ্গে প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ ও হয় যেমনি আমি বারংবার কোরআনের ব্যাখ্যার প্রতিযোগীতায় আমন্ত্রণ জানিয়েছি তাহলেও আল্লাহ্ তাকে লজ্জিতই করতেন। তাই কোরআনের জ্ঞান যা আমাকে আল্লাহ্তা'লার পক্ষ হতে দান করা হয়েছে এটি আল্লাহরই একটি নিদর্শন।

(সিরাজুল মুনীর , রুহানী খাযায়েন ১২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪১)

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ !

মুনসি এলাহি বখস্ সাহেব এ্যাকাউন্ট্যান্ট লাহোর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মুরিদ ছিলেন। ভালোবাসা ও আনুগত্যে অনেক অগ্রসর ছিলেন। সৈয়্যেদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যখন ১৮৮৯ সালে বয়আতের মাধ্যমে জামাতের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং মুরিদগণের বয়আত করতে বলেন হঠাৎ এলাহি বখস্ অস্বীকার করেন। কাদিয়ানে এসে তিনি প্রকাশ্যে নিজের স্বপ্ন ও এলহামের উল্লেখ করে বলেন যে, একটি স্বপ্ন আমি আপনাকে বলছি যে, আমি আপনার বয়আত কেন করবো আপনি আমার বয়আত করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর এই পুরানো বন্ধুকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য "জরুরতুল ইমাম" পুস্তকটি রচনা করেন।

তিনি বর্ণনা করেন :

"প্রিয় আমি তো বন্ধুত্বের, সত্যের ঐশী বরকাতের পিয়াসী, এসকল জিনিস এক সমুদ্র পান করেও তৃপ্তি পাই না। তাই যদি আমাকে কেউ নিজের মুরিদ বানাতে চায় তা সহজ পদ্ধতি বয়আতের তাৎপর্য ও তার আসল তত্বকথ কে মাথায় রেখে তা করুক। আর যদি তার কাছে এধরনের বন্ধুত্বের, সত্যতার ও ঐশী বরকতের সম্ভার থাকে যা আমাকে দেওয়া হয় নি বা তার কাছে কোরআনের রহস্য প্রকাশিত হয়েছে যা আমার অজানা তাহলে বিসমিল্লাহ্॥ আমাকে সে নিজের গোলামিতে নিক। আর আমাকে নিজের সেই বন্ধুত্বের, সত্যতার ও ঐশী বরকতের সম্পাদন করুক। আমি বেশি পরিশ্রম করতে চাই না, আমার এলহামের দাবিদার বন্ধু কেবলমাত্র সূরা এখলাসের ব্যাখ্যা করুক। সে তুলনায় আমি যদি এক হাজার গুণ বেশি উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা না দিতে পারি আমি তার অনুগত থাকবো।

(জরুরতুল ইমাম, রুহানী খাযায়েন ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪৯৮)

তিনি বর্ণনা করেছেন :

"আমাদের জামাতে আমার

হাতে বয়আতকৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন ব্যক্তি আছেন যিনি মর্যাদাসম্পন্ন জ্ঞানী।। গোটা পৃথিবীর তফসীর নিজের কাছে রাখেন সেইভাবে তার অন্তরেই হাজার হাজার কোরআনের তত্ত্বের খাযানা বিদ্যমান। যদি আপনাকে আমার উপর বয়আত নেওয়ার ব্যাপারে প্রধান্য দেওয় হয়ে থাকে তাহলে পূর্বে তাঁকে (হাকিম নুরুদ্দিন সাহেবকে) একপারা কোরআনের ব্যাখ্যা সহ বুঝিয়ে পড়িয়ে আসুন। তাঁরা (অর্থাৎ নুরুদ্দিন সাহেব (রাঃ)) পাগল তো নয় যে, আমার হাতে বয়আত করেছেন অন্য ইলহামপ্রাপ্তদের ত্যাগ করে।"

(জরুরতুল ইমাম, রুহানী খাযায়েন ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫০০)

তিনি বর্ণনা করেছেন -

"যদি তিনি (মুনসি এলাহি বখস্ সাহেব) নিজের এলহামি শক্তির দ্বারা মৌলবী সাহেব (হাকিম নুরুদ্দিন সাহেব (রাঃ)) কে নিজের কোরআনের উপর তাঁর জ্ঞান তা বোঝান এবং নিজের জাতীর দ্বারা নুরুদ্দিনের মত কোরআন প্রেমিকের প্রথমে বয়আত নিন তাহলেই আমি ও আমার সমস্ত জামাত তোমার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করে দেব।"

(জরুরতুল ইমাম, রুহানী খাযায়েন ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫০১)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ব্যাখ্যা করেছেন-

যেভাবে আমি দ্বীনের ও কোরআনের তত্ত্ব, সত্যতা ব্যাখ্যা সহ স্পষ্টভাবে লিখতে পারবো অন্য কেউ কখনোই তা পারবে না। যদি দুনিয়া ভোর লোকও একত্রিত হয়ে আমার পরীক্ষা করতে আসে তাহলেও আমাকেই জয়যুক্ত পাবে। আর যদি সকলে মিলেও আমার বিরোধীতা করে তাহলেও আল্লাহর ফযলে আমিই সবার উপর ভারি পড়বো।

(আইয়্যামে সুলাহ্, রুহানী খাযায়েন ১৪তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪০৭)

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ!

শেষে আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কিছু বর্ণনা উপস্থাপন করে আমার বক্তৃতা শেষ করছি। তিনি বর্ণনা করেছেন -

"কোরআনের তত্ত্ব প্রকাশিত হচ্ছে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আল্লাহর কালামের অর্থ খুলছে, ঐশী নিদর্শন প্রকাশিত হচ্ছে, ইসলামের সৌন্দর্য ও জ্যোতির ও বরকতের প্রকাশ আল্লাহতা'লা নতুনভাবে করছেন। যার দেকার চোখ আছে দেখুক আর যার মধ্যে প্রেরণা আছে সে চাইতে থাকুক আর যার মধ্যে বিন্দুমাত্র আল্লাহ্ ও রসূলের মহব্বত বিদ্যমান সে দন্ডায়মান হোক, পরীক্ষা করুক আর আল্লাহর তৈরী এই জামতের অন্তর্ভুক্ত হোক যা তার খুবই প্রিয়।

তাছাড়া এমন বলা যে, এখন ওহী বন্ধ হয়ে গেছে আর নিদর্শন প্রকাশ হতে পারে না আর দোয়াও কবুল হয় না, এসকল কথা বলা ধ্বংসের পথগামী হওয়া, আদৌ নিরাপদ নয়। আল্লাহর ফযলকে প্রত্যাখ্যান কোরো না। দন্ডায়মান হও ও যাঁচাই করো। তাও যদি মনে হয় আমি তুচ্ছ জ্ঞান রাখি তুচ্ছ বুদ্ধি সম্পন্ন বাজে কথা বলছি তাহলে আমাকে মেনো না। কিন্তু যদি ঐশী নিদর্শন দেখে থাকো আর সেই হাতের ছোঁয়া পাও যা সত্যবাদীরা ও আল্লাহর সঙ্গে বাক্যালাপকারীরা পেয়ে থাকে তাহলে স্বীকার করে নাও।

(বারাকাতুত্ দোয়া, রুহানী খাযায়েন ৬ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৪)

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

****

১৮ পাতার পর.....

নিতে হল। আর কম বেশি তিরিশ বছর ধরে এই মোকদ্দমা চলতে থাকল। আর আদালত থেকে কোন সিদ্ধান্ত না হওয়ার কারণে জামাত দারউল বয়আত থেকে দূর হয়ে গিয়েছিল। ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বরের শেষে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ)- কাদিয়ানে আগমন করেছিলেন। হুজুর আনোয়ারের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতের সময় অধম (হামীদ কওসার) দারউল বয়আত খালি হওয়ার জন্য দোয়ার আবেদন করে। আর আর্জি জানাই হুজুর এখন পরিস্থিতি এমন পর্যায় পৌঁছে গেছে যে, ঐ ঘরে যে আছে জামাতের সদস্যদেরকে দোয়া করার জন্য ভীতরে প্রবেশ করার অনুমতি দেয় না। হুজুর (আই.) বলেন - "আমাকে ইতিপূর্বেও এই ব্যাপারে কয়েকজন জানিয়েছিল। এর পরে হুজুর আনোয়ার কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন।"

এবং পরে বলেন - "ইনশা আল্লাহ তা'লা অনুগ্রহ করবেন।" হুজুর আনোয়ার পবিত্র যবান থেকে নির্গত এই দোয়ার শব্দ আল্লাহ তা'লার দরবারে কবুল হয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহের ধারা আরম্ভ হতে থাকল। এবং ঘর খালির পথের বাধা একের পর এক দূর হতে থাকে। বিরোধী পক্ষ পরাজিত হলে তা সত্বেও জামাত তার সঙ্গে অনুগ্রহের আচরণ করল। এবং বড় সংখ্যার একটা টাকা ওনাকে দিলেন, যার দ্বারা সে যেন নিজের বাসস্থান অন্য কোন জায়গাতে করতে পারে। আর সেদিকে লক্ষ্য রাখা হল যে, সে যেন অসুন্তষ্ট হয়ে দারউল বয়আত যেন না ছাড়ে। হুজুর (আই.) এর দোয়ার পরিণতিতে আল্লাহ তা'লা ওনার অন্তরকে সমাধানের প্রতি আকৃষ্ট করলেন। আর তিনি নিজের ইচ্ছায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে দারউল বয়আত ছেড়ে চলে যায়। আর ওনার জন্য ও আল্লাহ তা'লা উত্তম বাসস্থানের সুব্যবস্থা করে দিলেন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, হুজুর আনোয়ার (আই.) ১৫ জানুয়ারী ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দে কাদিয়ান থেকে চলে গেলেন। আর যাওয়ার কেবল একমাস পর ১৫ জানুয়ারী ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দে দারউল বয়আতে সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া দখল পেয়ে গেল। এটি হুজুর আনোয়ার (আই.)-এর দোয়ার ফল ছিল যে, ৫৯বছর পরে দারউল বয়আত জামাতের অধিনস্থ হল। আর এটি দর্শনার্থীদের জন্য দোয়া করার এবং নামাজ আদায় করার জন্য খুলে দেওয়া হল। আলহামদুলিল্লাহ্ এখন পর্যন্ত এই ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে।

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল-খামিস (আই.) খিলাফতে আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বের ঘটনা বর্ণনা করেন :

তার মধ্যে একটি হল - হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল-খামিস (আই.) বলেন, আমার বয়স ঐ সময় ১৭ বছর ছিল । আমার পিতা হযরত সাহেবযাদা মির্যা মনসুর আহমদ সাহেব মরহুম এর নিকট হতে কিছু চাওয়ার ছিল। কিন্তু আমি ওনার কাছ থেকে সরাসরি চাইছিলাম না, সেজন্য আমি আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করি যে, সে আমার পিতার অন্তরে জাগ্রত করে দিক যে, তিনি আমার ইচ্ছা পূরণ করে দিক। আল্লাহ তা'লা আমার দোয়া গ্রহণ করলেন, আর কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট পরে আমার পিতা আমাকে ডাকলেন আর আমার ইচ্ছা পূরণ করে দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ॥

আরও একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন- যদি পবিত্র হয়ে আল্লাহ তা'লার এবাদত করা যায়, তাহলে অবশ্যই তিনি দোয়া কবুল করেন। হুজুর আনোয়ার বলেন- একবার ছাত্র জীবনে আমার গণিতের পরীক্ষার সময় আমি তাতে ভালো করিনি। আর পরীক্ষার হল থেকে বাইরে এসে আমার মনে হল হয়ত আমি ফেল হয়ে যাব। সুতরাং আমি অনেক করে দোয়া করি যে, যাতে করে যেমন ভাবে হোক আমি পাশ হয়ে যাই। মসজিদ মোবারক রাবওয়ায় এক কোণে আমি একদিন অনেক দোয়া করি, আর সেই দোয়া আমার অন্তর থেকে নির্গত হয়েছিল, আর ঐ দোয়া দ্বারা আমার বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, আল্লাহ তা'লা ঐগুলো কবুল করে নিয়েছে। আর আমি পরীক্ষায় পাশ হয়ে যাব। যখন ফলাফল ঘোষণা হল তখন অসাধারণ ভাবে পাশ হয়েছিলাম। কিছুকাল পরে জানতে পারলাম যে, শিক্ষাবোর্ডের সিদ্ধান্ত ছিল যে, ছাত্রদের কিছু বোনাস নম্বর দেওয়া হোক। এই নম্বরের মাধ্যমে আমি পাশ হয়ে গেলাম।

শ্রদ্ধেয় শ্রোতামণ্ডলী! হুজুর আনোয়ার (আই.)-এর ঈমান উদ্দীপক ঘটনা তো অনেক আছে, সময়ের স্বল্পতার কারণে কিছু ঘটনা উপস্থাপন করা হল। কিন্তু এটা সত্য যে, বর্তমান যুগে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল-খামিস (আই.) সেই সত্বা যাঁর দোয়া আল্লাহ তা'লা শোনেন এবং কবুল ও করেন।

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল-খামিস (আই.) জামাতের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন- সুতরাং স্মরণ রেখ যে, দোয়া একটি শক্তিশালী অস্ত্র আর এর মহান বরকত আছে। সেজন্য তোমাদের প্রত্যেক কর্মে সাফল্যের জন্য দোয়ার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। আর নিজেদের স্থান বিস্তৃত কর। আপনি আপনার দোয়াতে নিজের এবং প্রিয়জনদের এবং আত্মীয় স্বজনদের জন্য দোয়া করতে থাকুন। খিলাফতের দৃঢ়তা ও জামাতের উন্নতির জন্য দোয়া করুন। উম্মতের জন্য দোয়া করুন। নিজের দেশের শান্তির জন্য এবং সমস্ত রকমের খুশহালির জন্য দোয়া করুন। নিজের পরিবার পরিজনদেরকেও দোয়ার বরকত সম্পর্কে জানাতে থাকুন। আল্লাহ তা'লা আপনাদের সকলকে গ্রহণযোগ্য দোয়া করার তৌফিক দিন। আমিন।

হাদীস

" নামায ত্যাগ করা মানুষকে শির্ক ও কুফরের নিকটবর্তী করে দেয়" (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: শামসের আলি, জেলা আমীর, বীরভূম

“বাশারাহ্ চাঁদা ও ওসীয়্যতের ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও কল্যাণ সমূহ”

মূল : কে. তারিক আহ্মদ, অনুবাদক : মাওলানা সাইফুদ্দিন সাহেব, মোবাল্লেগ সিলসিলা

বক্তৃতা সালানা জলসা ২০১৮

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ○ وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ○

সৈয়্যেদেনা হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করেন- “ কেমনই এ কল্যাণময় যুগ যে, কারো নিকট হতে প্রাণ চাওয়া হচ্ছে না। এবং এ যুগ প্রাণ দেবারও নয় বরং সামর্থ অনুযায়ী অর্থ খরচ করার যুগ।”

(আল হাকাম, কাদিয়ান, ১০ই জুলাই ১৯০৩)

এছাড়া ‘কিশতি-এ-নূহ’ পুস্তকে তিনি বর্ণনা করেন : “প্রত্যেক ব্যক্তির পুণ্যতা সেবা দ্বারা প্রকাশ পায়। প্রিয় বন্ধুগণ! এটা ধর্মের জন্য ও ধর্মের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সেবা করার সময়। এই যুগকে অসাধারণ যুগ ভাবা দরকার। কারন এই সময়কে আর পাওয়া যাবে না।”

(কিশতে-এ-নূহ, রুহানী খাযায়েন ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৮৩)

উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ!

আপনারা শুনেছেন যে, আজকে এই মহতি সভায় অধমকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, “বাশারাহ্ চাঁদা ও ওসীয়্যতের ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও কল্যাণ সম্পর্কে বন্ধুগণের সামনে কিছু আলোকপাত করব।

বন্ধুগণ!

এইমাত্র আমি আপনাদের সামনে সূরা মুনাফেকের ১০ ও ১১ নম্বর আয়াত পাঠ করেছি। সেই সকল আয়াতের অর্থ খলিফা রাবে (রহঃ)-এর অর্থ অনুযায়ী এইরূপ :“হে লোক সকল যারা ঈমান এনেছ তোমাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিগণ আল্লাহর স্মরণকে ভুলিয়ে না দেয়। যারা এইরূপ করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত। যা কিছু আমরা তোমাকে দান করেছি তা হতে তোমরা খরচ কর। সেই সময় উপস্থিত হবার পূর্বে যখন কিনা তোমাদের মধ্যে কারোও মৃত্যু বাস উপস্থিত হয়। তখন সে বলে হে আমার প্রভু হায়! যদি তুমি আমাকে ক্ষণেকের জন্য সময় দিতে তো আমি অবশ্যই সাদকা দিতাম এবং পুণ্যদের মধ্যে গন্য হতাম।”

শ্রোতাবৃন্দ !

খোদাতা’লা এই সকল আয়াত সমূহকে মহা তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। মানুষের যখন পৃথিবী হতে বিদায় নেবার সময় আসে তখন বিশেষ ভাবে এই অনুভূতি মানুষকে বিচলিত করে দেয়, হায়! তার জীবনে যদি কিছুক্ষণ সুযোগ দিত তো সে আল্লাহর পথে তার প্রিয় বস্ত সমূহ ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকত ও সেই সকল বস্ত ব্যয় করে কোন ভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতাম। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল যে, মানুষ শেষ মুহূর্তে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার কথা স্মরণ করে কেন। কী ভেদ যা তার মধ্যে হঠাৎ প্রকাশ পায়। যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য উত্তম ও কার্যকরী পন্থা হল আল্লাহর রাস্তায় নিজ ধন-সম্পদকে উৎসর্গ করা। যেমন কিনা হযরত মহম্মদ (সাঃ) মানুষের উহ্য অবস্থার চিত্র এই শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেছেন । হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-কর্তৃক বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন যে, হে আল্লাহর রসূল কী ধরনের সাদকাতে সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিদান পাওয়া যায় ? তিনি (সাঃ)- উত্তরে বলেন : “সেই ধরনের সাদকা যা তুমি সুস্থ অবস্থায় কৃপণতা সত্বেও করে থাক। একদিকে তুমি দুরদ্রতার ভয় করছ আর অন্য দিকে তুমি ধনি হবার চেষ্টা করছ, সাদকা খয়রাতে অলসতা দেখান উচিত নয়। যখন তোমার প্রাণ যাবার উপক্রম সেই সময় তুমি বলবে অমুকের জন্য এতটা অমুক জনের জন্য এতটা অথচ সেই সময় তো তোমার সম্পদ অপরের হয়ে গিয়েছে।

(সহী বুখারী কিতাবুয্যাকাত)

মহান আল্লাহ্ যিনি তার বান্দাগণের সব কিছু সম্বন্ধে অবগত। নিজ বান্দাগণের অন্তিমকালের হতাশা হতে মুক্তি দেবার জন্য সহানুভূতি হিসাবে বর্ণনা করেন :

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا○ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا○ (النساء:40،41)

অর্থাৎ - তাদের বাধা কী ছিল যে, তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনত ও শেষ বিচার দিবসের প্রতি এবং আল্লাহ্ তাদের যা দান করেছে তা হতে তারা খরচ করত। আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে খুব অবগত নিশ্চয় আল্লাহ্ বিন্দু পরিমাণ অত্যাচার করেন না। যদি কর কোন পুণ্য থেকে থাকে তো তিনি তাকে বৃদ্ধি করেন। এবং নিজে তার প্রতিদান দিয়ে থাকেন। সুতরাং সৌভাগ্যশালী ঐ ব্যক্তি যিনি প্রতিদানের যোগ্য হয়ে থাকেন। আল্লাহ্ সুস্থ াবস্থায় তাকে সুযোগ দিয়েছেন। আর্থিক বিষয়ে যে নিজের হিসাব নিকাশ পরিষ্কার রাখে তাদের পরিণাম উত্তম হয়। মানুষের যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় সেই সময় আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গের চিন্তা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবার চিত্র কোরআন ব্যক্ত করেছে তা ধ্বংসের কারণ ছাড়া আর কিছু নয়।

শ্রোতাবৃন্দ!

আর্থিক কোরবানীর গুরুত্ব এর দ্বারা প্রমাণ যে, সর্বোৎকৃষ্ট ইবাদত নামাজের নির্দেশের সাথে আর্থিক কোরবানী যাকাতের কথা বলা হয়েছে যে, অর্থাৎ যেমন তিনি নামাজের প্রতি জোর দিয়েছেন ঐরূপ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার জন্য জোর পূর্বক নির্দেশ দিয়েছেন।

কোরআনে আর্থিক ইবাদতকে চাঁদা রূপে দু’ই প্রকারে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমতঃ লাজেমী চাঁদা ও দ্বিতীয় তুয়ী (স্বতঃস্ফূর্ত) চাঁদা। আল্লাহর রসূল (সাঃ) ফরজ চাঁদা অর্থাৎ যাকাতকে ইসলামের একটি স্তম্ভ বলে বর্ণনা করেছেন। যাকাত ব্যতীত ধর্মের প্রয়োজনে খোদার নবীর ডাকে সাড়া দিয়ে আর্থিক কোরবানীতে অংশ গ্রহণকারীগণ প্রকৃত ইবাদত আদায়কারী ও খোদার সান্নিধ্য লাভকারী হয়ে থাকে।

খোদার রাস্তায়-অর্থদানের আহ্বানে সর্বকালের নবীগণের মান্যকারীরা সাড়া দিয়ে থাকেন। কিন্তু আল্লাহর রসূল হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর সাহাবীরা যে মর্যাদার সঙ্গে সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন তার স্মরণ আমাদেরকে আজও বরং কেয়ামত পর্যন্ত আমাদের হৃদয়কে উষ্ণতা দান করবে।

হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ানুযায়ী আমরা জানতে পেরেছি যে, ইসলামের বিশ্ব বিজয় ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদের দ্বারা হবে। সেই মহান উদ্দেশ্য পূরণের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এই যুগে আমাদেরকে আর্থিক কোরবানীর ডাক দিয়েছেন। সুতরাং যাকাত বা ফরজ চাঁদা আদায়ের পর ওসীয়্যতের ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী নিজ আয় ও সম্পদ হতে অর্থ উৎসর্গ করার ডাক দেন। এবং উক্ত ডাকে সাড়াদানকারীদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। যে সকল আহমদী ওসীয়্যতের ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করে নি তাদের উচিত নিজ আয়ের ১/১৬ (ষোলো ভাগের এক ভাগ) চাঁদা আম দান করে সেই উদ্দেশ্যকে পূরণ করা। তার সাথে সাথে ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণের ইচ্ছা রাখে ও দোয়া করতে থাকে যেন সে আল্লাহর কৃপায় ওসীয়্যতের ব্যবস্থাপনায় অংশ নেওয়ার সুযোগ লাভ করে।

বাশারাহ্ চাঁদা আদায়ের ফলে সে ওসীয়্যতের ব্যবস্থাপনায় অংশ নেওয়ার সুযোগ লাভ করবে। সুতরাং আমি আমার বক্তব্যে ক্রমান্বয়ে বাশারাই চাঁদা ও ওসীয়্যতের ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও কল্যাণ সম্পর্কে আপনাদের সম্মুখে কিছু উপস্থাপন করতে চাই।

যাকাত আদায়ের পর জামাতে আহ্মদীয়াতে প্রবেশকারী সকল পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ ও নারী নিজের আয়ের ১/১৬ (ষোলো ভাগের এক ভাগ) অংশ সংগঠনের সার্থে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আদায় করা আবশ্যক।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লাজেমী চাঁদা সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে বর্ণনা করেন : এই মহান জামাতে প্রবেশ করার তিনিই একমাত্র উপযোগী যার মহান সহযোগীতা আছেএবং পরবর্তীর জন্যে একটি নতুন ও সত্য প্রতিজ্ঞা খোদার নিকট করুন যে, নিয়মিত প্রতি মাসে নিজ আর্থিক আয় হতে ধার্মিক কাঠিন্য দূর করার জন্য প্রয়াস করতে থাকব।

বাশারাহ্ চাঁদা আদায়ের মানষিকতা তৈরী করার জন্য ঐ বিষয়টি অনুধাবন করা আবশ্যক এবং এই বিধিটি অনুধাবন না করার কারণে সমস্ত ধরনের কৃপণতা ও আর্থিক কোরবানী হতে দূরে অবস্থান করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেই বিষয়টি আল্লাহ্ বার বার বর্ণনা করেছেন :

أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ব্যয় কর তা হতে যা আমি তোমদেরকে দান করেছি। তার বিশদ ব্যাখ্যা এই স্বল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব নয়। সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উক্তি সমূহ বর্ণনা করছি : হুজুর (আঃ) বলেন - “এটা স্পষ্ট যে, তোমরা দু’টি বস্তুকে একত্রে ভালো বাসতে পারো না। তোমদের জন্য এটা অসম্ভব যে, তোমরা অর্থকে ভালো বাসবে এবং খোদাকেও। কেবল একটিকে ভালোবাসতে পারো। সুতরাং সৌভাগ্যশালী ঐ ব্যক্তি, যে খোদাকে ভালোবাসে। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি খোদার প্রেমে নিজ অর্থকে ব্যয় করে আমার বিশ্বাস অন্যের তুলনায় খোদা তাকে বেশি বরকত দান করবেন।

কারন, অর্থ উপার্জন নিজ ইচ্ছায় লাভ হয় না বরং খোদার ইচ্ছায় লাভ হয়ে থাকে।"

(মজমুয়া ইশ্‌তেহারাত ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪৯৭)

সুতরাং এই বিষয়কে অনুধাবন করা সর্বতভাবে আবশ্যক। বন্ধুগণ! খোদা তার বান্দার প্রতি আশ্চর্যপূর্ণ ব্যবহার করে থাকেন। তিনি নিজে অর্থ দান করে থাকেন আর নিজেই বলছেন সেই অর্থ হতে তাকে কিছু দান কর। যাতে আমি তোমাদেরকে তার অধিক দান করতে পারি। এই বিষয়ের প্রতিজ্ঞা তিনি তার বান্দার সঙ্গে করছেন।

যে স্থানে খোদা তার বান্দাকে তার রাস্তায় ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন সেখানে তিনি বলছেন : يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (البقرة220) অর্থাৎ - তারা তোমার নিকট প্রশ্ন করে যে, আমরা কি খরচ করব । হে নবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও (প্রয়োজনের মধ্য হতে) যা কিছু অবশিষ্ট থাকে। এবং যেখানে যেখানে আল্লাহ্ দান করার কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে তিনি বলেছেন : مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ আল্লাহ্ যাকে চান তাকে তিনি অগণিত রিযিক দান করে থাকেন। সুতরাং আল্লাহ্ দেওয়ার সময় অগণিত দেন কিন্তু আল্লাহর পথে খরচ করার নির্দেশ দেন তো সীমা নির্দ্ধারণ করে থাকেন। যাকে ইসলামের আর্থিক ব্যবস্থাপনার পরিভাষায় "শারাহ্" বলা হয়ে থাকে। যারা পাগল হয় তারা তাদের আয় যা তাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতার অধিক খোদার কৃপাযুক্ত ছিল তার ক্ষুদ্র অংশ ফেরত দেওয়ার সময় যেমন ভাবে হোক সর্বজ্ঞ খোদা হতে লুকাবার চেষ্টা করে। উক্ত বিষয় সম্পর্কে আমাদে;র পঞ্চম খলিফা বর্ণনা করছেন : "অনেকে এইরূপ ধারণা পোষণ করে থাকে আমার যা ট্যাক্স তা কম করে দিলে আমার এতটা বাঁচবে। হুজুর বলেন ধারণা করাতে কিছু যায় আসে না। খোদা ধারণার কারণে পাকড়াও করেন না। কিন্তু সেই চিন্তানুযায়ী সে যদি ট্যাক্স চুরি করে ও প্রশাসনকে ক্ষতি করে। তাই যদি কেউ চাঁদা লেখানোর সময় সঠিক আয় হতে কম লেখায় তো তখন আল্লাহ্ পাকড়াও করে থাকেন। অনেকের এইরূপ অভিজ্ঞতা আছে এবং অনেক লোকের দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছি। যাদের আয় কম লেখানোর কারণে তাদের আয় ধীরে ধীরে কমে গিয়েছে। যেমন তারা কম দিত তেমন তাদের আয় দাঁড়ায়। এটা এমন একটি পাপ যা পাকড়াও এর যোগ্য। মোট কথা অন্তর যখন তা করার জন্য দৃঢ়বদ্ধ হয় তখন সে ধোকাবাজি করতে শুরু করে। (খোতবা জুম্মা, ২৬ অক্টোবর ২০১৮)

ঐরূপ চতুর্থ খলিফা (রহঃ) বর্ণনা করেন : "আমার জীবনের অভিজ্ঞতা যারা আর্থিক কুরবানী সংক্রান্ত বিষয় আল্লাহর সহিত স্বচ্ছ রাখে না যারা নিজের আয় হতে আল্লাহর অংশ আলাদা করে না তাদের অন্যান্য বিষয় ও বিগড়ে যায়। ঘরের শান্তি লুপ্ত হতে থাকে। ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। তাদের বংশের তরবিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাধারণত মানুষের জীবনের কল্যাণ লোপ পায়।

(মালী নেযাম ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৯৬)

বন্ধুগণ!

সময় অনুযায়ী এখানে একটি ঈমান বর্দ্ধক ঘটনা বর্ণনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, কিরূপে আল্লাহ্ তাদের দান করে, যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে থাকে।

হযরত আমিরুল মো'মিনিন তাঁর ২৬ মার্চ ২০১০ সনের খোতবায় বর্ণনা করেন : "আইভরীকোষ্টের শহর (Bassam) একজন নতুন আহ্‌মদী মাননীয় Yago Alido সাহেবের নিকট জামাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী শারাহ্ অনুযায়ী যারা আম চাঁদা, ওয়াকয়ে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদ অনুযায়ী চাঁদা নেবার জন্য উপস্থিত হয় যা কিনা পঞ্চাশ পাউন্ডের সমান তার জন্য এটা ছিল বৃহৎ অঙ্কের টাকা। এটা তার আহমদীয়াত গ্রহণের পর প্রথম চাঁদা ছিল। বর্ণনাকারী বর্ণনা করে যে, সে সময় আমাদের মোয়াল্লেম সাহেব চাঁদার রসিদ কাটছিলেন, সেই মুহূর্তে তার নিকট একটি ফোন কল আসে সেই ফোনে তাকে একজন বলছেন যে, সেই ঋণের টাকা যা আমি তোমার নিকট হতে দু'ই বছর পূর্বে নিয়েছিলাম তা কাল এসে আমার নিকট হতে নিয়ে যাবে। আলিদো সাহেব আশ্চর্য হয়ে বর্ণনা করছিলেন ঐ ব্যক্তি ঋণ নিয়ে এমনভাবে ব্যবহার করছিলেন যে, তার নিকট হতে ঋণ ফেরত পাবার কোন আশা ছিল না। এটা কেবলমাত্র চাঁদা দেবার কারণে সসম্ভব হয়েছে। কেবলমাত্র তাই নয় কিছু দিন পরে সরকার হতে পত্র পান, সেই পত্রে লেখা ছিল আপনার চাকরির ক্ষেত্রে পদোন্নতি হয়েছে ও তার সাথে বেতন অর্দ্ধ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। তিনি তার নতুন বর্দ্ধিত বেতন অনুযায়ী চাঁদা দ্বিগুন করেন। এখন তিনি কেবল চাঁদা আদায় করেন না বরং মসজিদের শ্রী বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট খরচ করছেন। আর তিনি এটা বলে বেড়াচ্ছেন যে, এগুলো সমস্ত কিছু খোদার পথে আর্থিক কুরবানীর কারণে সম্ভব হয়েছে।

দেখুন কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা নবাগতদের مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق:4) এর দৃশ্য দেখাচ্ছেন। বরং فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗۤ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নগদ নগদ দান করছেন।

বন্ধুগণ! বাশারাহ্ চাঁদা আদায় করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ ও তার রসূলের আনুগত্য করা। বাশারাহ্ চাঁদা আদায় সম্পর্কে অনেক মসয় দুর্বল হৃদয়ের লোকেরা এই ধারণা পোষণ করে থাকে যে, আমি অতিরিক্ত ব্যয় করে ফেলছি। যাকে তারা বাহ্যত খরচ করছে সেটাকে আল্লাহ্ বর্ণনা করে বলছেন, এটা প্রকৃতপক্ষে ব্যয় নয়। বরং আমার সন্তুষ্টির জন্য আমার নির্দেশের কারণে যা তোমরা ব্যয় করে থাক সেটা প্রকৃতপক্ষে ব্যয় নয় বরং তোমার এ্যাকাউন্টে জমা হয়ে গেছে। আর যখন তোমার প্রয়োজন হবে আল্লাহ তা তোমাকে ফেরত দেবে। হাদিস কুদসী যাতে আঁ হযরত (সাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হে আদম সন্তান! তোমরা তোমাদের খাজানা আমার নিকট জমা করে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও। আগুন লাগবে না; পানিতে ডুবে যাবে না, কেহ চুরি করবে না। আমার নিকট গচ্ছিত খাজানা ঐদিন তোমাকে ফেরত দেব যেদিন তোমার খুব প্রয়োজন হবে।

(কানজুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫২, হাদিস নাম্বার ১৬০২১)

বন্ধুগণ! আমরা কতটা অর্থ আল্লাহর পথে খরচ করলাম তার গুরুত্ব নাই বরং এই কথার গুরুত্ব যে, আল্লাহ্ প্রেরিত পুরুষের নির্দেশ অনুযায়ী- "শারাহ্" অনুযায়ী আমরা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করছি কিনা। একজন ধনী ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ টাকা আল্লাহর রাস্তায় দান করে থাকে কিন্তু তার এই চাঁদা যদি বাশারাহ্ না হয়ে থাকে তার চেয়ে অধিক ঐ গরীব ব্যক্তির চাঁদা যা কুরবানী অনুযায়ী তার চেয়ে অর্থাৎ ধনী ব্যক্তির চেয়ে কম হতে পারে। কিন্তু ঐ গরীব ব্যক্তি আনুগত্যের উচ্চ পর্যায়ে বাশারাহ্ দিয়ে থাকেন। খোদার অর্থের প্রয়োজন নেই তিনি তোমাদের অন্তরের পরীক্ষা নেন। তিনি আনুগত্য ও কুরবানীকে দেখে আমাদেরকে দিয়ে থাকেন। আজ পৃথিবীর গরীব ও ধনী লোকেরা অতি শীঘ্র সম্পদকে দ্বিগুন ও তিনগুন করার জন্য তারা আকর্ষণীয় প্রচার পত্র দেখে নিজের উপার্জিত অর্থ ফাইন্যান্স কোম্পানীতে লাগিয়ে দেয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, তারা তাদের মূল পুঁজিকে খুইয়ে ফেলে। কিন্তু খোদার জামাত সর্বদা তার উপার্জনকে খোদার নির্দেশে ব্যয় করে খোদার সন্তুষ্টির আশায় থাকে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, "সর্বদা আমি আমার জামাতের সদস্যগণের নিকট হতে ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জামাতের নিকট হতে এটা আশা করতেন যে, আপনারা আপনাদের প্রাণ ও অর্থ উৎসর্গ করুন। কিন্তু প্রত্যকে যুগে এর পরিবর্তে দেখা গেছে। প্রথম দিন যারা এই আহ্বানকে শুনলেন তো তারা তাদের প্রাণ ও অর্থ উপস্থিত করলেন। তখন মসহি্ মাওউদ (আঃ) তাদেরকে বললেন, "তোমরা নামাজ পড় ও রোজা রাখ, ইসলাম ও আহ্‌মদীয়াতের প্রচার কর। নিজ অর্থ হতে কিছু কিছু ধর্মের সেবায় দান কর। যদিও সেটা স্বল্প হোক না কেন। লোকেরা এই কথা শুনে তাদের অন্তরে এই ধারণা জন্মায় যে, কাজটি খুবই সাধারণ ছিল। তাহলে তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমাদের প্রাণ ও সম্পদ আল্লাহর রাস্তার কুরবান করে দাও। কিছুদিন পরে তিনি পুনরায় আহ্বান করেন এবং বলেন যে, এখন প্রাণ ও সম্পদ উৎসর্গ করার সময় এসেছে, তখন পুনরায় তারা তাদের প্রাণ ও সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হয়। তো তিনি তাদের নির্দেশ দেন তোমরা তোমাদের টাকা পয়সা হতে এক টাকা চাঁদা দিয়ে দাও। কিছুদিন পর শব্দ উচ্চারিত হল, তোমরা তোমাদের প্রাণ সমূহ ও সম্পদ সমূহ ধর্মের সেবায় উৎসর্গ করে দাও। এই রূপে পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে থাকে। স্বল্প হতে আরম্ভ হয়ে এক পয়সা দুই পয়সা তারপর তিন পয়সায় পৌঁছায়। পুনরায় প্রশ্ন হয় উহা পয়সা নয়, তিন পয়সা করে দান কর। তিন পয়সা যখন তারা দিতে লাগলো তখন তাদের নির্দেশ হয় চার পয়সা করে দান কর। তারপর সময় এসে যায় যখন তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তোমরা তোমাদের সম্পত্তি ও নিজ উপার্জনকে ওসীয়্যত করো। ওসীয়্যতের জন্য কম পক্ষে দশ ভাগের এক ভাগ দান করতে হবে। পুনরায় তাদেরকে তিনি নির্দেশ দেন ঐ এক শতাংশ খুবই স্বল্প তাই তিন ভাগের এক ভাগ ওসীয়্যত করা আবশ্যক। যার সামর্থ্য আছে এর উর্ধ্বে উৎসর্গ করতে পারে। ঐ সকল লোক যাদেরকে আল্লাহ্‌তা'লা বোঝার জন্য হৃদয় দান করেছেন, চিন্তা করার জন্য মস্তিষ্ক দান করেছেন তারা জানত যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদেরকে ধীরে ধীরে সেই উদ্দেশ্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন যাহা ব্যতিত কোন জাতি জীবিত থাকতে পারে না।

যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর নির্দেশের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ হবে তখন অলসতার কারণে সময় অতিবাহিত হবার কারণে তোমাদের মধ্যে এই ধারণায় বদ্ধমূল হয়ে গেছে এখন প্রাণ ও অর্থ কুরবানীর অর্থ হল এক আনা বা দেড় আনা চাঁদা দান করা। এবং প্রাণের কুরবানীর অর্থ হল সপ্তাহে বা মাসে এক ঘন্টা বা দেড় ঘন্টা সময় দেওয়া। বরং এই সময় এক আনা বা দেড় আনা চাঁদা দিলে হবে না। বা নিজ সময় হতে এক ঘন্টা বা দেড় ঘন্টা সময় দান করলে হবে না। বরং সমস্ত অর্থ সমস্ত প্রাণ খোদার রাস্তায় দান করার সুযোগ হবে। সেই সময় এক আনা বা দেড় আনা চাঁদা দেওয়ার প্রশ্ন নয় বরং সমস্ত অর্থ ও সম্পদ ও প্রাণ এক নিমেষে ত্যাগ করার প্রশ্ন থাকবে।

(আল ফযল ১০ই এপ্রিল ১৯৬২ ও মজলিসে শুরা ১৯৪৬)

সুতরাং খলিফাগণ যেমন যেমন

আর্থিক কুরবানীর প্রয়োজন অনুভব করবেন তেমন তেমন তিনি আমাদের নর্দিেশ দেবেন। আর আমাদেরকে লাব্বাইক বলে প্রাণ ও সম্পদকে আল্লাহর পথে উপস্থাপন করতে হবে।

এখন এই অধম বক্তৃতার দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ ওসীয়্যতের ব্যবস্থাপনার প্রতি আলোকপাত করতে চায়।

বন্ধুগণ! এখন খোদার ইচ্ছা যে, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ আহ্‌মদী জামাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যে, ব্যবস্থাপনা বিশ্বরূপ নিতে যাচ্ছে। সেই বিশ্বকে পরিচালনা করার জন্য একটি পূর্ণ কার্যসূচী তৈরী করা আবশ্যক। সেই ব্যবস্থাপনার নাম হল : "ওসীয়্যতের ব্যবস্থাপনা"। সুতরাং হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) তার প্রকৃত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বর্ণনা করেন : "সুতরাং বর্তমান যুগের আবশ্যকতাকে পূর্ণ করার জন্য খাতামুল খোলাফার দায়িত্ব ছিল যে, ইসলামী নীতি অনুযায়ী কোন স্কীম গঠন করা। পৃথিবী হতে সেই বিপদকে সমূলে উৎপাটিত করা। ইসলামী স্কীমের প্রকৃত নীতি হল সমগ্র মানবের প্রয়োজনকে পূর্ণ করা। কিন্তু সেই কার্যক্রমকে পূর্ণ করার জন্য কোন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের সূক্ষ্ম আবেগকে নষ্ট না করা হয়। সেই কাজ হল ধনীদের নিকট হতে ইচ্ছাকৃত ভাবে নেওয়া এই ব্যবস্থাপনা জাতীয় না হয়ে আন্তর্জাতিক হতে হবে। খোদার প্রেরিত পুরুষ সেই ব্যবস্থাপনার ভীত ১৯০৫ সনে রেখেছিলেন। এবং সেটি **"আল-ওসীয়্যত"** দ্বারা রেখেছেন।

যদি ইসলামী রাজত্ব সমগ্র পৃথিবীকে খাদ্য দান করতে চায়, সমগ্র পৃথিবীকে পোষাক প্রদান করতে চায়, সমগ্র পৃথিবীর জন্য থাকার ঘর তৈরী করার ব্যবস্থা করতে চায়, সমগ্র পৃথিবীর অজ্ঞতাকে দূর করার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চায় তাহলে নিশ্চয় প্রশাসনের নিকট প্রচুর অর্থ থাকা আবশ্যক। যেমন কিনা পূর্বের যুগে হত। সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী ঘোষণা দিলেন এই যুগে খোদা সেই সকল ব্যক্তিদের জন্য যারা সত্যিকার অর্থে জান্নাত লাভ করতে চায় এই ব্যবস্থা করেছেন। তারা যেন ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজের সম্পদ হতে কমপক্ষে দশ ভাগের এক ভাগ এবং সর্বাধিক এক তৃতীয়াংশ ওসীয়্যত করেন। মোট কথা নতুন ব্যবস্থাপনার ভীত ১৯১০ সনে রাশিয়াতে রাখা হয় নি বা পরবর্তীতে কোন সময়-এ ইউরোপে রাখা হবে না। বরং পৃথিবীর মানুষকে প্রশান্তি দেবার জন্য প্রতিটি ব্যক্তির জীবনকে সুন্দরময় করার জন্য তার সঙ্গে ধর্মের সুরক্ষার জন্য নতুন ব্যবস্থাপনার ভীত ১৯০৫ সনে কাদিয়ানে রাখা হয়েছে। এখন পৃথিবীর আর কোন নতুন ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন নেই।

(মালি নেযাম পৃষ্ঠা : ৪০, ৪১)

বন্ধুগণ!

এটি আমাদের সৌভাগ্য যে, এই কল্যাণকর ব্যবস্থাপনার অংশীদার হবার সুযোগ আল্লাহ্ নিজ কৃপায় আমাদেরকে দান করেছেন। কেমন অকৃতজ্ঞ হব যদি আমরা দাবি করি যে, আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী আর বিপরীতে আমরা আবার উত্তম আন্দোলনে অংশ না নিয়ে থাকি। তাহলে নিজের দাবিকে মিথ্যা প্রমাণ করা হবে।

ওসীয়্যতের ব্যবস্থাপনায় অংশ নেবার জন্য যেমন জোর দেওয়া হয়েছে তা আপনারা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর একটি উক্তি দ্বারা অনুমান করতে পারেন। সেই উক্তিটি হল :

"মো'মিনের ঈমানের পরীক্ষা এর মধ্যে নিহিত যে, তারা এই ব্যবস্থাপনায় প্রবেশ করে খোদার বিশেষ কৃপা অর্জন করতে থাকে। কেবলমাত্র মোনাফেক এই ব্যবস্থাপনা হতে দূরে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে কারো উপরে বল প্রয়োগ নয়। কিন্তু তার সাথে এটাও বলে দিয়েছেন এর মধ্যে তোমাদের ঈমানের পরীক্ষা নিহিত আছে। যদি তোমরা জান্নাত লাভ করতে চাও তো তোমাদের জন্য এটা আবশ্যক যে, তোমরা এই কুরবানী করবে। হ্যাঁ যদি তোমাদের অন্তরে জান্নাতের সম্মান ও মূল্যবোধ না থাকে তবে তোমরা তোমাদের অর্থ নিজের নিকট গচ্ছিত রাখ। তোমাদের টাকা আমাদের কোন প্রয়োজন নেই।"

(মালী নেযাম, পৃষ্ঠা : ৪২)

সুতরাং জামাতের বন্ধুগণের উদ্দেশ্যে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন:

"যখন ওসীয়্যতের ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ হবে তো কেবল এর দ্বারা প্রচার-প্রসার সম্পন্ন হবে না বরং ইসলামের উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজন এর দ্বারা মেটানো হবে। দুঃখ ও দারিদ্রতাকে এর দ্বারা পৃথিবী হতে অপসারিত করা হবে। ইনশা আল্লাহ্ । এতিমগণ ভীক্ষা করবে না। বিধবারা লোকদের নিকট হাত পাতবে না। দরিদ্র মানুষ পেরেশান হবে না। কারণ, ওসীয়্যত শিশুদের মাতা স্বরূপ, যুবকদের পিতা স্বরূপ, মহিলাদের স্বামী স্বরূপ। বলপূর্বক নয় স্বেচ্ছায় এক ভাই অপর ভাইকে সাহায্য করবে। তার মূল্য বৃথা যাবে না। প্রত্যেক দানকারী খোদা হতে উত্তম প্রতিদান লাভ করবে। ধনী ক্ষতিগ্রস্ত হবেনা, গরীব ক্ষতিগ্রস্ত হবেনা। এক জাতি অন্য জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করবে না বরং তাদের পরোপকারীতা সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করবে। সুতরাং তোমরা শীঘ্র ওসীয়্যত করো, যাতে শীঘ্র নূতন ব্যবস্থাপনার ইমারত তৈরী হয়। সেই বরকতময় দিবস আগত যখন কিনা চতুর্দিকে ইসলাম ও আহমদীয়াতের পতাকা উত্থিত হবে। এর সঙ্গে আমি ঐ সকল বন্ধুগণকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যাদের ওসীয়্যত করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। আমি দোয়া করছি আল্লাহ্ সকল ব্যক্তিদের ঐ ব্যবস্থপনায় অংশ নেবার সুযোগ করে দিন। এবং তারা এই ব্যবস্থাপনায় অংশ নিয়ে ধর্ম ও পার্থিব কল্যাণে সম্পূর্ণরূপে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠুক।(মালী নেযাম, পৃষ্ঠা: ৪২)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করেন : "তোমরা ভেবনা যে, এটা কল্পনাতীত। এটা সেই সর্বশক্তিমান খোদার ইচ্ছা যিনি পৃথিবী ও আকাশ সমূহের প্রভু।"

এই সকল শব্দ দ্বারা ওসীয়্যতের মহান মর্যাদার চিত্র দৃষ্টি-গোচর হয়। এই সকল শব্দ সেই পবিত্র ব্যবস্থাপনার ভীত রাখার সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কলম হতে নিঃসৃত হয়। এবং আজ ১১৩বছর পূর্ণ হতে চলেছে বিশেষ করে পঞ্চম খলিফার কল্যাণময় যুগে ওসীয়্যতের ব্যবস্থাপনার বিশ্বরূপ দেখে হৃদয় খোদায় প্রশংসায় পুরপূর্ণ হচ্ছে। সুতরাং আমরা যারা ভারতবাসী এই ওসীয়্যতের ব্যবস্থাপনার উৎসস্থলে বাস করি আমাদের চিন্তা করা দরকার আমরা কতটা পরিমাণ সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে পেরেছি। খলিফার ডাকে আমরা সাড়া দিয়ে ঐ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণকারী হতে পারি।

এছাড়া তিনি বলেছেন - "এই ওসীয়্যত লেখার জন্য যার অর্থ চিরস্থায়ী দানকারী হবে তার জন্য চিরস্থায়ী প্রতিদান থাকবে। এবং চলমান খয়সাত (দান) বলে গণ্য হবে।"

এই সময়কে কাজে লাগিয়ে জামাতের বন্ধুগণের দৃষ্টি এই বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করতে চাই যে, পঞ্চম খলিফা বিশ্ব জামাতের কাছে একটি সন্দেশ দ্বারা ওসীয়্যতের ব্যবস্থাপনার দিকে শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ২০০৫ সনে নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

"সুতরাং যেমন কিনা আমি বলেছি এই ব্যবস্থাপনায় দৃঢ়তার সঙ্গে অংশ নেবে। যারা নিজেরা অংশ নিয়েছেন তারা নিজ স্ত্রী ও সন্তান দিগকে ও অন্যান্য প্রিয়জনদেরকে এতে অংশীদার করার চেষ্টা করুন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ডাকে সাড়া দিয়ে কুরবানীর উচ্চ স্থানকে অধিকার করুন। আমি পূর্বে এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম যখন ২০০৮ সনে খেলাফতের একশত বছর পূর্ণ হবে তখন পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক জামাতে যারা উপার্জনকারী যারা চাঁদা দেয় তাদের মধ্যে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এই ব্যবস্থাপনায় অংশ নেয়। এটা জামাতের সদস্যদের পক্ষ হতে আল্লাহর দরাবারে একটি ক্ষুদ্র উপহার। যা জামাত খেলাফতের একশত বছর পূর্তি উপলক্ষে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আল্লাহর দরবারে উপস্থাপন করবে।

এছাড়া তিনি বর্ণনা করেন :- ওসীয়্যতের ব্যবস্থাপনা খেলাফতের সঙ্গে গভীর সম্পর্কযুক্ত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার পর জামাতের তরবিয়তের ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন সেই জন্য তিনি আর্থিক কুরবানীর ব্যবস্থাপনা চালু করেন। তিনি জামাতকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, আমার মৃত্যুতে তোমরা দুঃখিত হবেনা। কারণ, খোদা এই জামাতকে ধ্বংস করবেনা। কারণ, দ্বিতীয় শক্তির হাত সবাইকে ধরে রাখবে। সুতরাং 'আল-ওসীয়্যত' পুস্তকে খেলাফতের ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণনা করাটা প্রমাণ করে যে, এই দু'টি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক আছে। যেমন ওসীয়্যতে অংশ নিয়ে মানুষ তাকওয়ার উচ্চ মর্যদা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারে ঐরূপ খেলাফতের জোয়াল কাঁধে থাকার কারণে তার আধ্যাত্মিক জীবন রক্ষা সম্ভব।

আর্থিক কুরবানীর ব্যবস্থাপনা খেলাফতের ছত্র-ছায়ায় দৃঢ়তা লাভ করতে পারে। সুতরাং যতক্ষণ খেলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকবে জামাতের আর্থিক কুরবানীর মর্যাদা বৃদ্ধি হতে থাকবে ও ধর্ম উন্নতি কজরতে থাকবে। সুতরাং আমার দোয়া আল্লাহতা'লা আপনাদের এই দুই ধরনের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত রাখুক। যারা এ পর্যন্ত এই ওসীয়্যতের ব্যবস্থাপনায় অংশ নেয়নি আল্লাহ্ তাদেরকে অংশ নেবার তৌফিক দান করুক। যাতে তারা এতে অংশ নিয়ে ধর্মীয় ও পার্থিব উন্নতি সাধন করতে পারে। যেন আল্লাহতা'লা প্রতিটি আহমদীকে খেলাফতের সঙ্গে যুক্ত থাকার সৌভাগ্য দান করে ও খেলাফত প্রতিষ্ঠা থাকার জন্য তারা যেন সর্বদা প্রয়াস করতে থাকে। নিজেদের সমস্ত উন্নতির জন্য খেলাফতের রজ্জুকে দৃঢ় ভাবে ধরে রাখতে পারে। আল্লাহ্ প্রত্যেক আহমদীকে নিজ দায়িত্ব বোঝার ও তা পূর্ণ করার তৌফিক দান করুন। আমাদের সবাইকে সন্তুষ্টির রাস্তায় পরিচালিত করে আমাদের পরিণামকে উত্তম করুন, আমিন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

আল্লাহ্‌র বাণী

"এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যেও নিশ্চয় শিক্ষণীয় বিষয়াবলী আছে। (আন-নাহল, আয়াত: ৬৭)

দোয়াপ্রার্থী: নুর আলাম, জেলা আমীর, জলপাইগুড়ি, (প:ব:)

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর অতুলনীয় ধৈর্য ও অবিচলতা

মূল : - মোহতরম মহম্মদ ইনাম গৌরী সাহেব নাযির-এ-আলা, কাদিয়ান

অনুবাদ : - আজিবুর রহমান, মোবাল্লিগ সিলসিলা

" আর কথা বলার ক্ষেত্রে তার চেয়ে উত্তম কে হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে ডাকে, সৎকর্ম করে এবং বলে,'নিশ্চয় আমি অত্মসমর্পণকারীদের একজন?' আর ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। যা সবচেয়ে উত্তম তা দিয়ে তুমি (মন্দকে) প্রতিহত কর। তাহলে যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল সে অচিরেই (তোমার)অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে। কিন্তু ধৈর্যশীল ছাড়া আর কাউকে এ (মর্যাদা) দান করা হয় না । আর যে (মহত্তের) এক বড় অংশের অধিকারী হয়েছে তাকে ছাড়া আর কাউকে এ (মর্যাদা) দান করা হয় না।"

(সূরা হা-মিম সিজদা, আয়াত: ৩৪-৩৬)

এই আয়াতগুলির মধ্যে এই মূলতত্ব বর্ণনা করা হয়েছে যে নিজের উত্তম কথা, এবং সৎ কাজের মাধ্যমে এবং মন্দের প্রতুত্তর ভালর মাধ্যমে দিয়ে অত্যন্ত ধৈয্যের সাথে লোকদিগকে আল্লাহর দিকে আহ্বান কারী। অতপর এই নিদর্শন অবলোকন করে ,যে রক্তের পিপাসু শত্রুও অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যায়। এই নিদর্শন সর্ব্বোচ্চ মর্যাদার সাথে সৈয়্যেদনা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নিজের গুণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে । যিনি সবচেয়ে বেশী ধৈর্যশীলদের সর্বাধিক ধৈর্যশালী ।আর সর্বাধিক সৌভাগ্যশালী ছিলেন।

শেষযুগের বর্তমান সময়ে হুজুর পাক (সাঃ) এর সত্য প্রেমিক ও পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী মসীহ মাওউদ ও মাহদীয়ে মাওউদ (আঃ) নিজের কর্মের ও আদেশের মাধ্যমে নিজের মালিক এবং নেতা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ধৈর্য ও স্থৈর্যের (দৃঢ়তার) উত্তম আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসরনে কর্মের ছবি পৃথিবীর সম্মুখে তুলে ধরেছেন। আজকের এই বরকতময় মজলিসে আমি সৈয়্যেদেনা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর ধৈর্যের এক দৃশ্য তুলে ধরার চেষ্টা করব। "বাড়ীর মধ্যে তাঁর (আঃ) এর ধৈর্য ও স্থৈর্য"(দৃঢ়তা) সর্ব প্রথম আমি হুযুর (আঃ) এর বাড়ীর ভিতরে ধৈর্য ও স্থৈর্যের অতুলনীয় ছবি পরিবেশন করছি। কেননা পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাই যে অনেক লোক এমন আছে যে বাড়ীর বাইরে ধৈর্য ধারণের প্রদর্শন করে। কিন্তু বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করেই ভীষন রাগীও বদমেজাজী হয়ে যায়। ছোট ছোট কথাতেই ঝগড়া শুরু করে দেয়। কিন্তু সৈয়্যদনা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বাড়ীর ভিতরে হোক কিংবা বাইরে ধৈর্য এবং বিনয়ের এক শ্রেষ্ট মুখমন্ডল পরিলক্ষিত হয়,তাঁর (আঃ) এর বাড়ী শান্তি এবং প্রসন্নতার জায়গা ছিল আর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে ধৈর্য এবং সহ্যই এমন এক সুন্দর ব্যাবস্থাপনা যা বাড়ীতে স্বর্গের ন্যায় বানিয়ে দিতে পারে একজন সুবিখ্যাত সাহাবী হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোটি (রাঃ) তাঁর নিজের পুস্তক (হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর জীবন চরিত) তাঁর (আঃ) এর বাড়ীর ধৈর্যও স্থৈর্য্য এর সুন্দর চিত্র এর রুপে লোকের সামনে রেখেছেন যে :-

"ভারতবর্ষে একজন বিখ্যাত পীরের খলিফা আছে, এক লাখের বেশি তার শিষ্য আছে। আর খোদার নৈকট্য প্রাপ্তির ও অনেক দাবী দার,তাঁর একান্ত নিকট জনের মধ্যে থেকে একজন সতীস্বাধী মহিলার হযরত সাহেবের(আঃ) বাড়ীতে থাকার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি হযরত (আঃ) এর বাড়ীতে ফেরেশতার ন্যায় থাকা, না কাহারও সহিত কোন কথা কাটাকাটি, না কোন হাঁসি ঠাট্টা যা কিছু বলা হয় তাই মেনে নিত যেমন একজন আনুগত্যের যোগ্য নেতার আদেশের অমান্য করা যায় না। সে এই সব দেখে অবাক হয়ে যায় এবং কয়েক বারসে অবাক হয়ে বলে ও দিয়েছে যে আমাদের হযরত শাহ সাহেবের চরিত্র এর সম্পূর্ণ বিপরীত।তিনি যখন বাইরে থেকে অন্দর মহলে প্রবেশ করলে যে একটা তটস্থ পরিবেশের সৃষ্টি হয়।এই ছেলেকে রাগের চোখে দেখা,ওই পরিচারিকার প্রতি অসন্তুষ্ট,ওই ছেলেকে মারধর, স্ত্রীর সঙ্গে তর্কবিতর্ক কেন খাবারের মধ্যে লবণ কম বা বেশি ,এই পাত্র এখানে কেন রাখা হয়েছে একই ওই জিনিসটা ওখানে কেন রাখা হল। তুমি কেমন অসভ্য মহিলা যে ঘর সংসারের সঠিক পরিচর্যা করতে পার না,যদি কোন খাবার কখনও মনের পছন্দ না হয় তো খাবারের পাত্রটাই দেওয়ালে আছাড় মারে। আর ঘরে এক বিলাপ সৃষ্টি হত। মহিলারা কেঁদে কেঁদে খোদার নিকট প্রার্থনা করত যে, শাহ সাহেব যেন ঘরের বাইরে থাকে।..... (কিন্তু হযরত (আঃ) এর এখানে) আশ্চর্য শান্তি এবং আন্তরিক ঐক্যও, শ্রেষ্টপদ মর্যাদা এবং দয়ায় ভরপূর রয়েছে। যে যতই গোলমাল বা চিৎকার হোকনা কেন সাধারণত অন্তরকে উড়িয়ে দেয় এবং গোলমালের জায়গায় বিনা কারণে ধাবিত করে। হযরত সাহেব (আঃ) এই সব জিনিসকে একটুও অনুভব করতেন না। এবং কখনও হয়রান হতেন না, এটা একটা এমন অবস্থা যার জন্য ঠাট্টা কারীরা ব্যাকুল থাকত। এবং অতি ভক্তলোকেরা খোদার নিকট কেঁদে কেঁদে চাইত। আমি অনেক যোগ্য লেখক গণের কাছ থেকে শুনেছি এবং দেখেছি যে তারা ঘরে বসে কিছু ভাবছে বা লিখছে আর একটা পাখি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আর পাখির আওয়াজে এত বোধশুন্য আর হয়রান হয়েছে যে তার চিন্তাভাবনা এবং লেখা সব পন্ড হয়ে গিয়েছে এবং পাখিটাকে তাড়ানোর জন্য ও মারার জন্য এমন ভাবে লাফায় যেমন কোন বাঘ, চিতা বাঘের উপর আক্রমণ করছে। কিংবা খুবই রাগান্বিত শত্রুর মোকাবিলা করছে আমি দেখেছি হযরত সাহেব (আঃ) খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রচ্ছেদ রচনা কালে এমনকি আরবী ভাষায় অতুলনীয় বাকপটু পুস্তক লিখেছেন এবং পাশেই চিৎকার এবং গন্ডগোল হচ্ছে,দুষ্ট বালকগণএবং মহিলারা ঝগড়া করছে। এমনকি তার মধ্যে হতে কতক হাতাহাতিতে লিপ্ত হচ্ছে এবং পুরো অন্দর মহল চালাকি করছে। কিন্তু হযরত সাহেব (আঃ) এমন ভাবে লিখে যাচ্ছেন আর কাজের মধ্যে এমন ভাবে ডুবে গেছেন যেন তিনি একাই এক নিরিবিলি জায়গায় বসে আছেন এই সকল অতুলনীয় পুস্তকাদী আরবী উর্দু ,ফারসী এমন স্থানে লিখেছেন, আমি একবার জিজ্ঞাসা করলাম হুজুর এত চিৎকার চেঁচামেচিতে আপনার লিখতে কিংবা চিন্তা ভাবনা করতে অসুবিধা হয় না। মৃদু হেঁসে বললেন আমি তো শুনিই না তো হতবুদ্ধিতা কেন হবে এবং কেমন করে হবে। এক বারের বর্ণনা-মাহমুদ চার বছর এক মাসের ছিল,হযরত সাহেব (আঃ) নিজের রিতিমত ভিতরে বসে লিখছিলেন। মিয়া মাহমুদ দেশলাই নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন আর তাঁর সাথে বাচ্চাদের দল ছিল প্রথমে কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে খেলাধুলা এবং ঝগড়া করলো। আবার মনে যা এলো তাই পান্ডুলিপি গুলিতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে হাঁসছেনএবং হাততালি দিচ্ছেন এবং হুজুর (আঃ) লেখাতে এমন মগ্ন যে মাথা তুলে দেখছেন ও না, যে কি হচ্ছে? একটু পরে আগুন নিভে গেছে এবং অমূল্য পন্ডুলিপি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। হযরত সাহেব যখন লিখিত প্রচ্ছেদ গুলি মিলানোর জন্য পিছনের কাগজ পত্র দেখার প্রয়োজন হল, তখন মাহমুদকে জিজ্ঞাসা করলেন তো তিনি চুপ হয়ে যান,অবশেষে এক বাচ্চা বলে যে মিয়া সাহেব কাগজ পুড়িয়ে দিয়েছে, মেয়েরা, বাচ্চারা, এবং বাড়ীর সকলে অবাক যে এখন কি হবে। বস্তত অভ্যাস অনুযায়ী তাদের সবার খুবই খারাপ পরিস্থিতি এবং জঘন্য দৃশ্য হওয়ার সম্ভাবনা এবংঅপেক্ষা ছিল আর হওয়ারই কথা কিন্তু হযরত সাহেব মৃদু হেসে বলেন ভাল হয়েছে এতে আল্লাহতা'লার কোন বড় উপদেশ বা বিচক্ষণতা আছে আর এখন খোদাতা'লা চায় যে এর চেয়ে ভাল রচনা আমাকে বোঝাবে।" (মসীহ মাওউদ (আঃ)এর জীবন চরিত, পৃষ্ঠা ১৩-১৭) হুজুর (আঃ) কে আল্লাহতা'লার তরফ থেকে যে বিশাল ধৈর্যশক্তি প্রদান করা হয়েছে। তার আরও একটি আকর্ষণীয় ও মন জয়ী উদাহরণ হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোটি (রাঃ) এর মুখ নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করুন তিনি বলেন ঃ-

" হযরত সাহেবের উদ্দীপনা এবং দয়া এরকম ছিল যে আমিশত বার দেখেছি তিনি (আঃ) উপরে দালানে বসে লিখছেন বা ভাবছেন। আর তিনি (আঃ) এর পুরানো অভ্যাস ছিল যে দরজা বন্ধ করে বসতেন। এমতাবস্থায়

এক ছেলে এসে জোরে জোরে খট খট করে সাড়া দিল এবং মুখেও বললেন যে আব্বা দরজা খুলো, হুজুর (আঃ) উঠে দরজা খুলে দিলেন, বাচ্চাটা ভিতরে এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার বেরিয়ে গেল। হযরত সাহেব আবার দরজা বন্ধ করে দিলেন। দু মিনিট পরে ছেলেটা আবার উপস্থিত হয়ে জোরে জোরে ধাক্কা দিল এবং চিৎকার করল যে-

আব্বা দরজা খুলো, তিনি আবার ও উঠে দরজা খুললেন, এবার ও বাচ্চাটা ভেতরে না ঢুকে শুধুমাত্র মাথাটা ভিতরে প্রবেশ করিয়েই আপন মনে কিছু বক বক করে আবারও চলে গেল। হযরত (আঃ) খুবই প্রসন্নতার সহিত এবং ধৈর্য সহকারে দরজাবন্ধ করে নিজের জরুরী কাজে লিপ্ত হলেন। সবে মাত্র পাঁচ মিনিট হয়েছে আবার সে হাজির, আবার সেই চিৎকার যে- আব্বা দরজা খুলো, হুজুর (আঃ) উঠে সেই গাম্ভীর্যতার এবং প্রসন্নতার সাথে দরজা খুললেন। এবং মুখ থেকে একটা শব্দও বের করলেন না। যে তুমি কেন আসছ? এবং কি চাইছ? আর তোমার উদ্দেশ্যটাই বা কি? যে তুমি বার বার আসছ আর বিরক্ত করছো। আর কাজে বিঘ্ন ঘটাচ্ছো। আমি হিসাব করলাম সে কমপক্ষে বিশ(২০) বার এরকম করল। আর এর মধ্যে হযরত সাহেব একবারও মুখে ধমকানি বা বকাবকি করেন নি।"

(হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর জীবন চরিত, পৃঃ ৩৮)

ঠিক এই রকম আরও কিছু ঘটনা স্মরণ করতে গিয়ে মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোটি (রাঃ) বলেনঃ-

" অনেক সময় গ্রাম্য মেয়েরা যারা ঔষধাদির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে এসে জোরে জোরে ঠক ঠক করে, আর নিজেদের গ্রাম্য ভাষায় বলে যে মির্যা জি দরজাটা একটু খুলুন । হযরত সাহেব তখনই উঠে এসে এমন ভাবে দরজা খুলতেন যেমন কোন বিশাল আনুগত্য যোগ্য লোকের আদেশ এসেছে, আর হাসি মুখে গিয়ে দরজা খুলতেন এবং কথা বলতেন ,আর ঔষধ বলে দিতেন। আমাদের দেশের লোকেরা সময়ের মূল্য বোঝে না। আর গ্রাম্য লোকেরা তো আরও বেশি সময় নষ্ট করে। একজন মহিলা অনর্থক কথাবার্তা বলতে লাগল, তার নিজের ঘরের এবং সংসারের অত্যাচারের অভিযোগ শুরু করে দিল আর প্রায় এক ঘন্টা এতেই নষ্ট করে দিত। তিনি (আঃ) গাম্ভীর্যের এবং ধৈর্যের সহিত বসে বসে শুনতেন। মুখ দিয়ে কিংবা ইশারায় বলতেন না যে হয়েছে এখন যাও, ঔষধ তো জিজ্ঞেস করে নিয়েছ এখন আবার কি কাজ রয়েছে, আমার সময় নষ্ট হচ্ছে এমনটি বলে তখন সে নিজেই পালিয়ে যেত।" (হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর জীবন চরিত, পৃঃ ৩৯-৪০)

অসুস্থতার সময় ধৈর্য

নবী (সাঃ) এর হাদীসের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, মসিহ মাওউদ দুটি হলুদ চাদরে আবৃত হয়ে আসবে এর মধ্যে এটি অন্তর্নিহিত ছিল যে মসীহ রোগগ্রস্থ হবেন কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তিনি তাঁর উদ্দেশ্যকে ধৈর্য ও স্থৈর্যেও (দৃঢ়তার) মাধ্যমে সম্পূর্ণ করবেন। অতএব মাথা ব্যথা এবং বহু রোগ তাঁর সারা জীবন ছিল। অনেক সময় তাঁকেশত শত বার প্রস্রাবের পয়োজন হত পরন্তু তিনি খুবই ধৈর্যও সহ্য সহকারে এই ব্যাধি গুলির কষ্টকে সহ্য করেছেন। তিনি (আঃ) যখন অসুস্থ হতেন তখন তাঁর হাত ঠান্ডা হয়ে যেত শরীরের শিরাগুলি শক্ত হয়ে যেত বিশেষ করে ঘাড়ের শিরা আর মাথা ঘুরতো আর ঐ সময় তিনি তার নিজেরশরীরকে সামলাতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর এই সকল রোগ ব্যাধি থাকা সত্বেও তিনি (আঃ) তাঁর উদ্দেশ্যে সাফল্যমন্ডিত হয়েছেন।

হযরত আইয়ুব (আঃ) বিভিন্ন রোগ ও কষ্টকে সহ্য করে আইয়ুব-এ-সাবের এর উপাধি লাভ করেছিল। আর তিনি (আঃ) ও তাঁর ঐ ব্যাধি গুলির উপর ধৈর্যও স্থৈর্য দেখিয়ে হযরত আইয়ুবএ- সাবের এর আশ্চর্যকে আর একবার পুনরাবৃত্তি করেছেন।

রোযার মাধ্যমে ধৈর্য

ইসলাম ধর্মে রোযাকেও ধৈর্যের মাপকাঠি করা হয়েছে সুতরাং আঁ হযরত(সাঃ) বলেছেন যে, রমযান মাস ধৈর্যের মাস আর ধৈর্যের ফল জান্নাত। কোরান করীমে বর্ণনা আছে, যে ধৈর্য ধারণ করে তাকে ইহকালে কালে ও পরকালে জান্নাত দেওয়া হয় । সেইজন্য তিনি (আঃ) আট নয় মাস ধারাবাহিক ভাবে নফল রোজা রাখতেন। আর এমনই এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ধৈর্যের উদাহরণ স্থাপন করতে থাকেন । সেই সময় তাঁর (আঃ) খাদ্য সামান্য পরিমাণ হয়ে গিয়েছিল।

সন্তানদের মৃত্যুর পর ধৈর্য ধারণ ধৈর্য

সাধারণত বহ্যিক রূপে প্রাকৃতিক এবং দৈহিক জিনিস যা মানুষকে সর্বদা করতে হয়। আর মানুষ অনেক কান্না কাটির পর ধৈর্য ধারণ করে থাকে। কিন্তু এই রূপ ধৈর্য চরিত্রের মধ্যে নেই। আর না মানুষের চারিত্রিক উচ্চতার (মর্যাদার) প্রমাণ আর না কোন পুণ্যেও রুপে বদল প্রাপ্ত হতে পারে যা নিজে থেকেই প্রকাশ হয়। কিন্তু আসল ধৈর্য সেটাই যার ব্যখ্যা আঁ হযরত (সাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, 'আসসাবর এনদা সাদমাতেল উলা' প্রকৃত ধৈর্য এটাই যা প্রথম আঘাতের সময় করা হয়। যখন আমরা হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর জীবনীর উপর দৃষ্টি রাখি তখন আমরা জানতে পারি যে তিনি (আঃ) এই কথার কার্যকারী ছিলেন। তাঁর উপর সকল প্রকার বিপদ ও দুঃখ এসেছে কিন্তু তিনি পাহাড়ের ন্যায় নিজে অটল ছিলেন । আর ঐ কষ্ট বিপদাবলী তাঁকে ধৈর্যের স্থান থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। তিনি (আঃ) খোদার নিকট হতে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে এই ঘোষণা দেন যে খোদা আমাকে এক অতুলনীয় পুত্র দান করবেন। পরন্তু খোদা প্রথমে তাকে কন্যা সন্তান দান করেন, লোকেরা হাসি ও বিদ্রুপ করল। তিনি এই হাসি বিদ্রুপকে অতি ধৈর্যের সাথে সহ্য করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে কন্যাটিও ইন্তিকাল করে মনে হচ্ছে জন্ম এবং মৃত্যু দুটোই দুঃখের কারণ হয়, কিন্তু তিনি ধৈর্য ধরে রেখে ছিলেন। যে মহৎ ধৈর্য ও স্থৈর্যের নমুনা তিনি তাঁর প্রথম কন্যা আসমাতের মৃত্যুর সময় করেছেন তা মাওলানা আব্দুল করিম সাহেব শিয়ালকোটি (রাঃ) নিজের ভাষায় এভাবে বর্ণনা করেছেন বলেন যেঃ-

তাঁর (আঃ) প্রথম কন্যা আসমত লুধিয়ানাতে কলেরা রোগে আক্রান্ত হল। তিনি তাঁর চিকিৎসায় এতকিছু করতেন যে তাকে ছাড়া বাঁচাই বেকার আর একজন সাংসারিক পৃথিবীর পরিচয়ে এবং পরিভাষায় বাচ্চাদের ভুকা এবং মোহিত এরচেয়ে বেশি দুঃখ করতেই পারেনা কিন্তু যখন সে মারা গেল তিনি এমন ভাবে আলাদা হয়ে গেলেন যে কোন জিনিস ছিলই না আর তখন থেকে কখনও স্মরণ পর্যন্ত করেণ নি যে কোন কন্যা ছিল। এই খোলা মেলা এবং মসালেমত আল্লাহর ইচ্ছাতে আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তি ব্যতিত অসম্ভব। (সীরত হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)লেখক হযরত আব্দুল করিম পৃঃ ৮০) এইভাবে তাঁর প্রিয় পুত্র মির্যা মুবারক আহমদ মৃত্যু বরণ করেন তখন ধৈর্যের এমন অদর্শ প্রকাশ করেন যা তিনি (আঃ) এর মনিব হযরত মহম্মদ (সাঃ) ও তাঁর পুত্র হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর মৃত্যুর পরে করেছিলেন আর মানুষ হইবার জন্য তিনি (সাঃ) এই কথা বলেছিলেন -" চোখদিয়ে অশ্রু ঝরছে আর হৃদয় দুঃখ ভরা আর মুখ দিয়ে কেবল সেই কথা বের হয় যাতে আমার প্রভুর সন্তুষ্টি লাভ হয়। আর হে ইব্রাহিম আমি তোমার বিচ্ছেদে দুঃখিত। (বুখারী ২য় খন্ড , কিতাবুল জানায়েজ) অতএব হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) তার নিজের কবিতাতে তার নিজের পংক্তিতে ব্যক্ত করেন। যা দয়াদ্র বাপের মানবিক প্রয়োজনের কারণে লাহক হয়েছিল। কিন্তু শেষ পংক্তিতে 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন' এর ব্যাখ্যা অতি সহজ ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি (আঃ) বলেনঃ- হৃদয়ের টুকরো মুবারক আহমদ যার পবিত্র মুখমন্ডলও পবিত্র চরিত্রবান ছিল সে আজ আমার থেকে বিচ্ছেদ হয়েছে আমাদের হৃদয়কে দুঃখিত করে যখন খোদা তাকে ডাকল তখন তার বয়স ছিল আট বছর কয়েক মাস আহ্বান কারি হল সবচেয়ে প্রিয় এ হৃদয় তার উপরে তুই জীবনকে উৎসর্গ করছে।

সাহেব জাদা মির্যা মুবারক আহমদ সাহেব যখন মৃত্যু বরণ করলেন তখন তিনি (আঃ) নিজের বন্ধুদেরকে ধৈর্য ধারণ ও খোদার সন্তুষ্টির জন্য পত্র লেখা শুরু করেন। এইভাবে পৃথিবীর বুকে ধৈর্যের এক অসাধারণ ও অদ্ভুত উদাহরণ স্থাপন করে দিয়েছেন। যে নিজেই শোকার্ত হওয়া সত্বেও সহানুভূতি না নিয়ে অন্যদেরকে ধৈর্যের উপদেশ দিচ্ছেন। এই বিষয়ে একটি বর্ণনা হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সিরাতুল মাহদী চতুর্থ খন্ড ৪০ পৃষ্ঠাতে এই ভাবে লেখেনঃ-

মালিক মওলা বখশ সাহেব মৌলভী আব্দুল রহমান সাহেব মুবাশ্বর এর কাছে থেকে বর্ণনা করেছেন যে সাহেবজাদা মুবারক আহমদ সাহেব যখন অসুস্থ ছিলেন

তখন তার সম্বন্ধে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) দুঃশ্চিন্তায় থাকতেন যখন সাহেবজাদা সাহেব মৃত্যু বরণ করেন তখন সরদার ফজল হক সাহেব আর ডাক্টার এবাদুল্লাহ সাহেব এবং সমবেদনাকারী লোকেরা কাদিয়ানে আসলেন। কিন্তু যখন হুজুর মসজিদে আসলেন তখন হুজুর আগের মতন বা তার থেকেও বেশি আনন্দিত ছিলেন। যখন সাহেবজাদার মৃত্যু প্রসঙ্গ আসল তখন হুজুর বললেন যে মুবারক আহমদ মৃত্যু বরণ করেছেন। আমার প্রভুর কথা পূর্ণ হল সে আমায় পূর্বেই বলে দিয়েছিল যে এই ছেলে হয় শীঘ্রই মারা যাবে, নয়তো অতি খোদা ভক্ত হবে। অতএব আল্লাহ তাকে ডেকে নিয়েছেন এবং মুবারক আহমদ কেন যদি হাজার ছেলে হয় আর হাজারটাই মারা যায় শুধু আমার মওলা খুশি হোক আর তার কথা পূর্ণ হোক। আমার খুশি এরই মধ্যে আছে। এই অবস্থা দেখে আমাদের মধ্যে কারো কোন আফসোস করার সাহস হল না। বর্ণনায় মধ্যে এও এসেছে যে সাহেবজাদা মুবারক আহমদ এর মৃত্যুর পর তিনি (আঃ) উম্মুল মোমেনিন (রাঃ) অধিক ধৈর্য ধারণের কথা উল্লেখ করতে গিয়েদীর্ঘক্ষণ বক্তৃতা দেন। আর বলেন যে যখন কোরান শরীফের মধ্যে আছে 'ইন্নাল্লাহ মা'আ সবেরিন' অর্থাৎ আল্লাহ ধৈর্য ধারণ কারীদের সঙ্গে আছেন' তার থেকে বেশি আর কি চাই।(সীরাতল মাহ্দী, জিলদ ২ পৃঃ ৯৩) এই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ধৈর্যকে খোদা তায়ালা ইলহামের মাধ্যমে অতি প্রশংসা এবং খুশির সুসংবাদশুনিয়ে ছেন যে "খোদা প্রসন্ন হয়েছে" ।

সুতরাং খোদার সন্তুষ্টির থেকে বড় কোন সম্মান ও মর্যাদা নেই যা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ধৈর্যের মাধ্যমে তিনি(আঃ) পেয়েছেন। আত্মীয়দের দেওয়া কষ্টের উপর ধৈর্য তিনি (আঃ) কে নিজের লোকেরাও কষ্ট দিয়েছে এবং অন্য লোকেরাও প্রাথমিক অবস্থায় চাচী সাহেবারা তাঁকে দস্তরখানের অবশিষ্টাংশ খাদ্য খাওয়ার জন্য পাঠাত কিন্তু তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ছিলেন, কখনও উফ্ পর্যন্ত করেননি। তিনি (আঃ) সেই দিনগুলির কথা মনে করে যে

কবিতা লেখেন ঃ–

যার অর্থ - এমন একটা সময় ছিল যে দস্তরখানের অবশিষ্টাংশ আমার খাদ্য ছিল কিন্তু আজ আমার দস্তর খান থেকে বংশের পর বংশ পালিত হচ্ছে।

হুযুর (আঃ) এর চাচাতো ভাই তার অত্যন্ত বিরোধী ছিল। তাঁকে (আঃ) কে দুঃখ কষ্ট দেওয়াতে কোন রকমের উপেক্ষা করত না গালি দিত উচ্চ শব্দে ধিক্কার দিয়েকথা বলত। তার নিকট আগত মেহমানদেরকে মন্দ ধারণা দিত। আসা যাওয়া করা প্রত্যেককে কষ্ট দেবার চেষ্টা করত। যা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কে সারাসরি কষ্ট দেওয়ার কথা ছিল।কেননা তার মেহমানদের প্রতি খুব খেয়াল থাকত আর তাদের কষ্টকে তিনি নিজের কষ্ট বলে মনে করতেন, তার চাচাতো ভাইদের মধ্যে মির্যা ইমাম উদ্দিন ও হযরত (আঃ) ও তার জামাতের সাথে অত্যন্ত শত্রুতা ছিল আর সে সুক্ষতার কষ্ট মনে করতেন। তার খুব খেয়াল থাকত আরতাদের কষ্টকে তিনি নিজের কষ্ট মনে করতেন। একবার তিনি অন্য ভাইদের সাথে মিলে যে রাস্তাটা বাজার আর মসজিদে মুবারকে ছিল, একটা দেওয়াল দিয়ে বন্ধ করে দিল। আর তিনি (আঃ) এর জন্য প্রচন্ড কষ্ট পেয়ে ছিলেন। কিন্তু তিনি এমন কোন সিদ্ধান্ত নেননি যা ঝগড়া ফাসাদ সৃষ্টি হতে পারে। এই ঘটনার ব্যাখ্যা 'হযরত ইয়াকুব আলি সাহেব ইরফানি' সাহাবী হযরত আকদস মসীহ মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করেন ঃ–

"দেওয়াল আমাদের চোখের সামনে তৈরী হচ্ছিল আর আমরাকিছু করতে পারছিলাম না। তার কারণ এই ছিল না যে আমি কিছু করতে পারতাম না, বরং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর শিক্ষা ছিল যে, মন্দের মুখাপেক্ষী মন্দ দিয়ে কোরো না। ..... সেই দিনগুলি আশ্চর্য জনক ছিল । দুঃখের পর দুঃখ আসত। আর জামাত ঐ পরীক্ষার মধ্যদিয়ে এক সুস্বাদু ঈমানের সাথে নিজের অগ্রগতির স্থান গুলি অতিক্রম করছিল। অতএব সেই দেওয়াল গাঁথা হয়ে গেল আর এইভাবে আমরা সবাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য মসজিদে মুবারকে যাওয়া থেকে বঞ্চিত হলাম আর মসজিদে মুবারক যাবার জন্য হযরত সাহেবের ঘর এক চক্কর ঘুরেআসতে হত। আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক দুর্বল ও বৃদ্ধ মানুষেরা ছিল কিছু অন্ধ ব্যক্তি ছিলেন আর বৃষ্টির দিন ছিল। রাস্তায় কাদা হয়ে যেত। আর তাদের কাপড় তরল কাদাতে ভিজে যেত। ওই সমস্ত কষ্টের কথা কল্পনা করাও কঠিন যখন কিনা আহমদীয়া চকের মধ্যে পাকা মেঝের উপর দিয়ে লোকেরা যাতায়াত করছে। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) নিজের খুদ্দামদের এই কষ্ট দেখে খুবই কষ্ট অনুভব করতেন। কিন্তু কোন রাস্তা ছিলনা হযরতের খোদার নিকট কান্না কাটি ছাড়া। যদিও সেই দেওয়াল হয়ে গেছে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে আর পানি পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । অবশেষে বাধ্য হয়ে আদালতে যেতে হল। আর আদালতের বিচারে দেওয়ালে প্রস্তুত কারককে নিজের হাতেই দেওয়াল ভাঙতে হয়েছিল । যেটি নিজেই একটা নিদর্শন ছিল। আদালত কেবল দেওয়াল ভাঙার আদেশ দিলনা বরং বাধ্যবাধকতা এবং খরচের ডিগ্রিও দ্বিতীয় পক্ষকে করে দিল।" (সীরাত হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) লেখক হযরত ইয়াকুব আলি সাহেব ইরফানি (রাঃ) ২য় খন্ড, পৃঃ- ১২৩)

হুযুর (আঃ) সমস্ত দুঃখ কষ্টকে অত্যন্ত ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে সহ্য করেছেন। এবার যখন বদলা নেওয়ার পালা এল তখন তাদের উপর থেকে জরিমানা মাফ করে দিলেন। যেমন ভাবে দয়ার সাগর মক্কা বিজয়ের সময় সাধারণ ভাবে এই ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, 'লা তাসরিবু আলাইকাল ইয়াম' অনুরূপ ভাবে তিনি (সাঃ) এর সত্য প্রেমিক ও নিজের ভাইদের দুঃখ ও কষ্টকেভুলিয়ে দিয়ে তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন যেমন ভাবে ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদের কষ্ট দেওয়ার উপর ধৈর্য ধারণ করেছিলেন অনুরূপ ভাবে এই জামাতের ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের কষ্টকে কেবল ধৈর্যের সাথে সহ্য করেনি বরং অনুগ্রহ পূর্বক ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। গালি-গালাজ ও কাফেরী ফতোয়ার প্রতি ধৈর্য এটি চিরন্তন প্রথা যে নবীগণের সঙ্গে সর্বদা ঠাট্টা বিদ্রুপ হয়ে থাকে। আর এটিও একটি অটল রীতি যে নবীরা সর্বদা বিরোধীদের এবং শত্রুদের অপবাদের উপর ধৈর্য দেখিয়েছেন । আর সর্বদা খোদার সাহায্য ঐ সমস্ত ধৈর্য শীলদের সাথে রয়েছে।

সুতরাং এই ক্রমাগত প্রথার ঠিক অনুরূপ হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) কেও মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, হুযুর (আঃ) কেও কাফেরের ফতোয়াদেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন নোংরা নাম দিয়ে তাকে স্মরণ করতো কাফের,দাজ্জাল, মুলহিদ (কাফের), ঠগ,দাগাবাজ আর দুনিয়াদার বলা হয়েছিল।

এটা কি ধরণের অত্যাচার যে উম্মতের সবচেয়ে বড় হিতাকাঙ্খীকে দাজ্জাল বলা হয়েছে,এতে তার অন্তর খুব ক্ষত এবং বেদনাপূর্ণ হয়ে গিয়েছে মনমরা আর দুঃখিত হয়ে তিনি তাঁর প্রিয় প্রভুর নিকট এমনই বিলাপ করেনঃ–

অর্থাৎ হে আমার প্রভু আমি তোমার নিকট ব্যাকুল বিলাপনিয়ে এসেছি কেননা জাতি আমাকে কাফের আখ্যা দিয়ে কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু তিনি শত্রুর মুখ থেকে চালিয়ে যাওয়া ঐ সমস্থ দুঃখ জনক তীরের আঘাতে ও ধৈর্য ধারণ করেছেন , যেমন ভাবে তায়েফের অসৎ ব্যক্তিদের কষ্ট দেওয়ার পরহযরত মহম্মদ (সাঃ) ধৈর্য ধারণ করে এই দোয়া করেছেন । হযরত মহম্মদ (সাঃ) এর গোলাম সাদেক (একনিষ্ঠ দাস) ও ধৈর্যধারণ করে বলেনঃ– তিনি (আঃ) যেমন উচ্চ পর্যায়ের ধৈর্য ক্ষমতার বাহক ছিলেন তার বর্ণনা তিনি (আঃ) নিজেই করেছেন। তিনি (আঃ) বলেনঃ–

"আমি আমার আত্মাকে এতটা দমিয়ে রাখি আর খোদাতা'লা আমার আত্মাকে এমন আনুগত্য কারী বানিয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি এক বৎসর যাবৎ আমার সামনে বসে আমাকে নোংরা থেকে নোংরা, গালা গালি দিয়ে থাকে অবশেষে সেই লজ্জিত হবে আর তাকে স্বীকার করতে হবে যে, সে আমার পা কে নিজের জায়গা থেকে সরাতে পারেনি। (সীরাত হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) লেখক হযরত আব্দুল করীম সিয়ালকোটি (রাঃ), পৃঃ-৭৬) শক্তিশালীর উদাহরণ আঁ হযরত (সাঃ) এমন ভাবে দেন যে : -শক্তিশালী সে নয় যে কুস্তিতে অন্য কে পরাজিত করে বরং শক্তিশালী সেই ব্যক্তি যে রাগের সময় নিজের রাগকে দমন করে নেয়। রাগকে পান করে নেয় আর কষ্ট দাতার জন্য শুভাকাঙ্খী হয়। অতএব হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এই যুদ্ধক্ষেত্রেও সেই শক্তিধর এবং বিখ্যাত বিজেতা এই যুগে প্রমাণিত হয়েছে যার উদাহরণ পওয়া খুবই অসম্ভব। আর তিনি (আঃ) কে কেউ যদি উত্তেজিত করত তো খুবই গাম্ভীর্য,

এবং পবিত্রতা এবং ধৈর্যের সাথে প্রদর্শিত হতেন। আর সর্বদা ধৈর্যের উপদেশ এবং ওসিয়ত করতেন :-

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

(সূরা বালাদ, আয়াত-১৭) এর প্রতি আমল কর। মসীহিয়ত ও মেহদীয়ত হওয়ার দাবীর পর হযরত (আঃ) এর বিরোধীতা এবং দুঃখ কষ্ট দেওয়া অস্বাভাবিক ভাবে চরম শিখরে পৌঁছে গিয়েছিল । ইসলাম দুনিয়ার মধ্যে মধ্যে ভয়াবহ চেঁচামিচি এবং মহা প্লাবনের ন্যায় দুষ্টুমি শুরু হয়ে গিয়েছিল। আর দিনের পর দিন বিরোধীতার এ আগুন দ্রুততর হচ্ছিল আর কেবল মুসলমানরা নয় বরং আর্য্য এবং খৃষ্টানরা ও এক জোট হয়ে হযরত (আঃ) এর বিরুদ্ধাচারণ করেছিল। আর তাঁর বিরুদ্ধে এমন ধরণের বিষোদ্গার করেছিল । আর এমন ধরণের নোংরা কথাবার্তা করতেন যে আল্লাহর আশ্রয় চাই। নোংরা গাল মন্দতে ভরা পত্র তাকে পাঠান হত। আর ঐ পত্রগুলি তিনি একটি বাক্সের মধ্যে যত্নসহকার রেখে ছিলেন। আল্লাহর ধৈর্য ও স্থৈর্যের কেমন ই এক নিদর্শন। মানুষ নিজের বিরুদ্ধেকথা শুনে ভয়ঙ্কর হয়ে যেত কিন্তু এখানে ধৈর্য ধারণের চিত্র নোংরা ভাষায় ভরা পত্রগুলি পুরস্কার ভেবে রক্ষিত করেছেন। আর তার পরিবর্তে দোয়ার উপহার তাদেরকে পাঠাতেন। তিনি (আঃ) একবার হযরত মুনসি আরোড়া খান সাহেব হযরত মুন্সি জাফর আহমদ সাহেব, হযরত মহম্মদ খান সাহেব যাঁরা তাঁর পুরানো সঙ্গী ছিলেন। দিল্লিতে এইজন্য ডেকেছিলেন, যে ওখানে বিরোধীতা চরমে ছিল। লোকেরা ইট,পাথর ছুড়তো আর প্রকাশ্যে গালা গালি দিও। তিনি (আঃ) তাদের এইজন্য ডেকেছিলেন যে গালি শুনে তারা পুণ্যতা অর্জন করে। (সীরাতুল মাহদী, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা- ১০৩) একবার হুজুর লাহোরে ছিলেন ,সিরাজ উদ্দিন নামের এক ব্যক্তি বাজারের সামনে আসল আর অভদ্র ভাষায় গালি দিতে লাগল । হুজুরের হাতে গোলাব ফুল ছিল সেটির সুগন্ধ নিচ্ছিল। সে গালি দিতেই থাকল। এমনকি তিনি (আঃ) নিজের থাকার জায়গায় চলে এলেন, সে সেখানেও চলে এলেন আর প্রায় ত্রিশ মিনিট সেখানে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত নোংরা কথাবার্তা বলতে থাকলেন। তিনি (আঃ) চুপ করে বসে ছিলেন। যখন শান্ত হয়ে গেলেন তিনি (আঃ) বললেন, শুধু এই, আরো কিছু বলুন। সে লজ্জিত হয়ে ফিরে গেলেন। তিনি (আঃ) নিজের জীবনের শেষ ভ্রমণ লাহোরে করেছিলেন, হুজুর (আঃ) পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে শহরে এক অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং প্রচন্ড চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়। যাতে মান্যকারী এবং অমান্যকারী দুই দলই ভিড় করেছিল। এই অস্বাভাবিক দৃশ্য হযরত ভাই আব্দুর রহমান সাহেব কাদিয়ানী (রাঃ) অত্যন্ত উত্তম গুণাবলীর সাথে কিছু এইভাবে বর্ণনা করেন। এই স্বীকারে এবং মানুষদের প্রত্যাবর্তন কে মৌলভীদের অন্তরে বিচলিত হয়ে গিয়ে ছিল। সে এই দৃশ্যকে সহ্য করতে পারেনি এবং নিজে থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি আড্ডার জায়গা তৈরী করেন যেখানে প্রতিদিন বিরোধীতার বক্তৃতা চলত। গাল মন্দেও ধুম ধামে মিথ্যার আর অপরাধের এমন লজ্জাজনক দৃশ্য করত যে মানবতা তাদের এমন কর্মের উপর মাথা চাপড়াতো আর চারিত্রিক সৌন্দর্য কে নিঃশেষ করে দিয়েছিল। বেইজ্জতি ও দিল দুঃখানো এমন ভাবে করা হত যে সহ্য করার ক্ষমতার বাইরে ছিল। নিরুপায় হয়ে হেয় হয়ে কয়েকজন বন্ধুমিলে হযরত (আঃ) এর নিকট নিজেদের বেদনার প্রকাশ করায় তখন হুজুর (আঃ) এই উপদেশ বাণী দেন :-

"গালি শুনে দোয়া দাও দুঃখ পেয়ে আনন্দ দাও" ধৈর্য ধারণ কর এব ওদের গালি-গালাজে কোন ভ্রুক্ষেপ কোরো না পাত্রের মধ্যে যা কিছু থাকে সেটাই বেরিয়ে আসে। আসলে ওরা বোঝেনা কেননা এইভাবে তো আমাদের বিজয় আর নিজেদের পরাজয়ের প্রমাণ পৌঁছে দেয়, আমাদের সত্যতা আর নিজেদের মিথ্যার উপর সততার মোহর লাগিয়ে দেয়। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কান বন্ধ করে নিয়ে বেরিয়ে আসবে। প্রবাদ বাক্যে আছে- "ধৈর্যের প্রতিফল ভালো"।

হুজুর (আঃ) এর এই উপদেশ কার্যকারী হয়েছে অনুসারীগণ কানের মধ্যে তুলো দিয়ে আর কলিজাতে পাথর বেঁধে এই সমস্ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন উফ পর্যন্ত করেননি। আর নিজের মনিবের শিক্ষার প্রতি এমনভাবে কার্যে পরিনত করে দেখিয়ে ছিল যার উদাহরণ এই পৃথিবীতে খুবই কম পাওয়া যায়। এই রূপে আর সুন্দর ও সু-মধুর ফলও পেতে শুরু হয়ে গেছে আর বিরুদ্ধবাদীদের চরম বিরোধীতার সত্বেও ভদ্র আর পবিত্র মনের লোকেরা সেই সময়ে এত বিপুল ভাবে বয়আত করেছে যে আমাদের পত্র পত্রিকা ঐ নাম গুলি প্রকাশের জায়গা পায়নি এবং ঘোষণা করা হয়েছিল যে উপযুক্ত জায়গায় ইনশাআল্লাহ পর্যায় ক্রমে বয়াতকারীদের নাম ছাপিয়ে দেওয়া হতে থাকবে। (সীরাতুল মাহ্দী, ২য় খন্ড পৃঃ নং ৩৮৯)

মাননীয়, এটাই সেই অগণিত ফল যার অঙ্গিকার ধৈর্যশীল বান্দাদের জন্য আল্লাহতা'লা এই শব্দ গুলির মধ্যে বলেন ঃ-

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

আর এই সর্বোচ্চ পুরস্কার হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কে নিজের নিরুপম ধৈর্য ও স্থৈর্যের পরিণতিতে দান করেছিলেন। ঐ অনুগ্রহরাজী খোদা যে সর্বদা ধৈর্যবানদের সাহায্য কারী হয়ে থাকে তিনি (আঃ) কে এই সর্বোত্তম ধৈর্য ও স্থৈর্যের ফলে দুই জগতের অনুগ্রহরাজী তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। আর তিনি (আঃ) কে মসীহিয়ত মাহদীয়ত এর সর্ব্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এর উপাধী পেয়েছিলেন। মোট কথা হযরত (আঃ) কে ধৈর্য ও স্থৈর্যের কারণে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। আর এক জগৎ তার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিল। আর তাঁর কথা প্রতিনিয়ত এক নুতন মর্যাদার সহিত সম্পূর্ণ হচ্ছে।

"ঐ সময় আসছে যখন ঈসা (আঃ) বলে আহবান করবে আমাকে এখন তো অল্প রয়ে গেছে দাজ্জাল বলার দিন।" যে অপরিহার্য ধৈর্য ও স্থৈর্যের উদাহরণ তিনি (আঃ) জীবন ভোর প্রকাশ করেছিলেন তাঁর সারাংশ হযরত মৌলভী আব্দুল করীম শিয়ালকোটি (রাঃ) তাঁর নিজের ভাষায় এমনই বর্ণনা করেছেন,

'আমি বিভিন্ন শহর ও অজানা জায়গাতে তাঁর (আঃ) এর সাথে ছিলাম দিল্লির অকৃতজ্ঞ এবং ব্যতিব্যস্ত সৃষ্টির বিপরীত পাটিয়ালা,জলন্ধর, কপুরথলা, অমৃতসর, লাহোর, শিয়ালকোট, এর বিরুদ্ধবাদীদের ঐক্যমত এবং একাকী মনে দুঃখ কষ্ট দেওয়া সত্বেও অস্বাভাবিক ধৈর্য, নরম মেজাজী ও মজবুতি দেখেছি তিনি কখনও কারো সামনে এটা প্রকাশ ও করেন নি যে অমুক জাতি অমুক ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে অভদ্র আচরণ করেছে। এবং অমুক ব্যক্তি মুখ দিয়ে এই বলেছে। আমি পরিস্কার দেখতে পাচ্ছিলাম তিনি একটি পাহাড় যার মধ্যে দুর্বল কাপুরুষ ইঁদুর সুড়ঙ্গ করতে পারে না।

(সীরাত হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) পৃঃ-৭৮,৭৯)

সব শেষে সৈয়্যদনা হযরত আকদস মসীহ মাওউদ (আঃ) এর এক উদ্ধৃতি শুনিয়ে আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

হুজুর (আঃ) বলেন :- আমাদের জামাতের জন্য এই ধরনের মুশকিল আছে যেমন হুজুর পাক (সাঃ) এর সময় মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল সুতরাং নতুন এবং সব থেকে প্রথম বিপদ তো এটাই যে যখন কোন মানুষ এই জামাতের অন্তর্ভূক্ত হয় তখনই বন্ধু, আত্মীয় স্বজন এবং পাড়া প্রতিবেশী আলাদা হয়ে যায়। এমন কি কোন কোন সময় মা, বাপ, বোন ,ভাই ও বিরোধী হয়ে যায় । সালাম বিনিময় ও থাকে না আর জানাজা পড়তে চায় নাএই ধরণের মুশকিল সম্মুখে আসে। আমি জানি কিছু দুর্বল চিত্তের মানুষ ও হয়। এবং এই বিপদাবলী আসা জরুরী তোমরা আম্বিয়া এবং রসূল গণের থেকে বেশি নও। তাঁদের উপর এই ধরণের বিপদাবলী এবং মুসীবত এসেছিল এবং এগুলি এই জন্য আসে যেন খোদার প্রতি পূর্ণ ঈমান দৃঢ় হয় এবং পবিত্র পরিবর্তনের সুযোগ আসে, দোয়ার মধ্যে কালতিপাত কর কেননা এটা খুবই প্রয়োজন। যেন তুমি আম্বিয়া এবং রসূলগণের আনুগত্য কর এবং ধৈর্যের পন্থা অবলম্বন কর।..... তুমি নিজের পবিত্র উদাহরণ উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখাও। কেননা তুমি ভাল রাস্তা অবলম্বন করেছ।দেখো আমি এই আদেশের জন্য আদিষ্ট হয়েছি , যেন তোমাদের বার বার হেদায়াত করি যেন সকল প্রকার ফাসাদ এবং ঝগড়ার জায়গা থেকে বাঁচো এবং গালি শুনে ধৈর্য ধারণ কর। মন্দের উত্তর পুণ্যের মাধ্যমে দাও। আর যদি কেউ ঝামেলা বা ফাসাদকরতে চেষ্টা করে, সেখান থেকে চলে যাও এবং শান্ত ভাবে উত্তর দাও।..... আমি তোমাদের সত্য সত্যই বলছি যে কখনও ধৈর্য হারিও না। ধৈর্যের হাতিয়ার এইরকম হয় যা কামানের গুলির দ্বারা হয় না। তা ধৈর্যের মাধ্যমে হয়, ধৈর্যই মানুষের অন্তর জয় করতে পারে। (মলফুজাত খন্ড ৪ পৃঃ ১৫৭-১৫৮)

আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করি, আমাদের এই পবিত্র উপদেশাবলীর উপর আমল করার সৌভাগ্য দান করুন (আমিন)।

সম্পাদকীয়র শেষাংশ.....

করেছিল। অতঃপর সেও মারা গেল। লেখরাম তিন বছরের মধ্যে আমার মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করে সেও মারা গেল- এগুলি কি অসাধারণ নিদর্শন নয়? ' (তোহফা গোল্ডবিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃ: ৪৫)

যে ব্যক্তিই মসীহ মওউদ-এর জন্য মৃত্যুর দোয়া চেয়েছে, শীঘ্র সে নিজেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে।

'আমি কোনভাবেই বিশ্বাস করি না যে, নবুয়তের যুগের পর খোদাাকে লাভকারী এবং সত্যবাদী কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কখনও কোন বিরুদ্ধবাদী এমন সুস্পষ্ট পরাজয় ও লাঞ্ছনা ভোগ করেছে যেরূপে আজ আমার শত্রুরা পরাস্ত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। তারা আমার সম্মানে আঘাত হেনে পরিশেষে নিজেরাই অসম্মানিত হয়েছে। তারা আমার প্রাণের উপর আক্রমণ করে বলেছে যে, এই বক্তির সত্য মিথ্যার প্রমাণ হল সে আমাদের মধ্যে প্রথমে মারা যাবে। কিন্তু নিজেই মারা গেল। মৌলবী গোলাম দস্তগীরের পুস্তক হাতের নাগালেই রয়েছে, বেশ কিছু সময় পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে পড়ে দেখুন কিরূপ ধৃষ্টতার সঙ্গে সে লিখেছিল যে, আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী হবে, সে প্রথমে মারা যাবে। এরপর সে নিজেই মারা যায়। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, যারা আমার মৃত্যুর জন্য লালায়িত ছিল এবং খোদার কাছে দোয়া করেছিল যে, আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী সে যেন প্রথমে মারা যায়-তারা সকলেই মারা গেছে। এক বা দুই ব্যক্তিই এমন কথা বলে নি, বরং পাঁচজন ব্যক্তি এই কথা বলার পর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে।(তোহফা গোল্ডবিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃ: ৪৬)

প্রথমত, তোমাদের মধ্য থেকে আলিগড়ের মৌলবী ইসমাঈল আমার বিরোধিতা করে দাবি করল যে, আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী সে প্রথমে মারা যাবে। তোমরা অবগত আছ, হয়তো দশ বছর পূর্বে সে মারা গেছে। সন্ধান করলে মাটিতে তার অস্থি ও দেহাবশেষের কিছুই পাওয়া যাবে না। অতঃপর পাঞ্জাবের মৌলবী গোলাম দস্তগীর কুসুরী আমার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ায়। আত্মাম্ভরিতা তাকে ঘিরে ধরে আর নিজের রচিত পুস্তকে আমার বিরুদ্ধে লেখে যে, আমাদের দুজনের মধ্যে যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী সে প্রথমে মারা যাবে। কয়েক বছর হল সেও মারা গেছে। প্রকাশিত সেই পুস্তক এখনও মজুদ আছে। অনুরূপভাবে মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী বিরোধীতায় ওঠে আর আমার বিরুদ্ধে একটি ইশতেহার প্রকাশ করে মিথ্যাবাদীর উপর অভিসম্পাত করে। এর কিছুকাল পরে সে অন্ধ হয়ে যায়। দেখ এবং শিক্ষা গ্রহণ কর। এরপর মৌলবী গোলাম মহিউদ্দীন লাখোকে দাঁড়ায়, সেও একই ধরণের ইলহাম প্রকাশ করে অবশেষে পৃথিবীতে থেকে গত হয়। এরপর আব্দুল হক গযনবী ওঠে এবং আমার বিরুদ্ধে মোবাহালা করে দোয়া করে যে, যে- বক্তি মিথ্যবাদী তার উপর খোদা তা'লার অভিসম্পাত আর খোদার আশিসরাজি থেকে সে বঞ্চিত থাকবে, পৃথিবীতে তার গ্রহণীয়তার কোন চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না। এখন তোমরাই দেখ, সেই দোয়ার কি ফল প্রকাশ পেয়েছে। এখন সে কোন অবস্থায় রয়েছে আর আমি কোন অবস্থায় রয়েছি? দেখ, এই মোবাহালার পর প্রত্যেক বিষয়ে খোদা তা'লা আমাকে উন্নতি দান করেছেন এবং পার্থিব ও অপার্থিক অসাধারণ সব নিদর্শন প্রকাশ করেছেন এবং এক বিরাট সংখ্যক মানুষের মনোযোগ আমার প্রতি নিবদ্ধ করেছেন। অথচ মোবাহালার সময় হয়তো চল্লিশ জন ব্যক্তি আমার শুভাকাঙ্খী ছিলেন। আজ তাদের সংখ্যা প্রায় সত্তর হাজার। আর আজ পর্যন্ত আর্থিক বিজয় হিসেবে দুই লক্ষেরও অধিকও রূপি দান করেছেন এবং পৃথিবীর হৃদয় এমন ভক্তিতে আপ্লুত করেছেন যেরূপে একজন দাস প্রভুভক্তি প্রদর্শন করে। পৃথিবীর সর্বত্র আমাকে খ্যাতি দান করেছেন। কাদিয়ানে এসে দেখ যে, ভক্তরা কিভাবে ঘাঁটি গেঁড়ে বসেছে। অপরদিকে অমৃতসরে আব্দুল হক গযনবীকে কোন দোকান বা বাজারঘাটে চলাফেরা করতে দেখে অনুমান কর যে সে কোন অবস্থায় রয়েছে! বড়ই পরিতাপের বিষয়, স্বর্গলোক থেকে খোদার শক্তি প্রকাশ্যে আমার সমর্থনে অবতীর্ণ হচ্ছে, কিন্তু এরা সনাক্ত করে না। (নুযুলুল মসীহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৮, পৃ: ৪০৯)

অনেকে আমার নিদর্শন প্রকাশের কারণে নিজে থেকেই আমার শত্রুতে পরিণত হয়েছে। কেননা, তারাই আমার বিরোধীতা করে দোয়া করেছিল যে, আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী সে যেন প্রথমে মারা যায়। যেমন মৌলবী গোলাম দস্তগীর কসুরী এবং মৌলবী ইসমাইল আলিগড়ি। এবং মিথ্যাবাদীর উপর অভিসম্পাত করে মহম্মদ হোসেন দোয়া করে, কিন্তু এর পরে তারা সকলেই মারা যায়। নিশ্চিতি জেনে রেখ, যদি তাদের মধ্য থেকে এক হাজার মৌলবীও আমার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় এমন দোয়া করত যে, আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী সে যেন প্রথমে মারা যায়, তবে অবশ্যই উলেমাদলের সকলেই মারা যেত, যেভাবে এরা মারা গেছে। কোন অহংকারী মৌলবী এই নিদর্শনের বিষয়েও কি সন্দেহ করবে?

(নুযুলুল মসীহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৮, পৃ: ৪০৯)

নয় বছর পূর্ণ হল, সিররুল খুলাফা পুস্তকের ৬২ নং পৃষ্ঠায় বিরুদ্ধবাদীদের উপর ধবংস এবং প্লেগ নেমে আসার দোয়া করা হয়েছিল। অতএব এযাবৎ হাজার হাজার বিরুদ্ধবাদী প্লেগ এবং অন্যান্য বিপর্যয়ে ধ্বংস হয়েছে। সেই দোয়াটি নিম্নরূপ-

وخذ ربّ مَن عادى الصّلاح و مُفسدًا
و نزّل عليه الرِجْز حقًّا و دَمّرِ
وَفَرِّجْ كُرُوبِيْ يَا كَرِيْمِى وَ نَجِّنِيْ
و مزّق خصيمى يَا اِلٰهى و عَفّرِ

অনুবাদ: হে আমার খোদা! প্রত্যেকে বিশৃঙ্খলাপরায়নের উপর প্লেগ নাযেল কর বা অন্য কোন প্রকারে মৃত্যু দিয়ে তাদের ধ্বংস কর, তাদেরকে পাকড়াও কর। আর আমাকে দুঃখ থেকে মুক্তি দাও। আমার শত্রুকে চূর্ণবিচূণ করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দাও। সুতরাং এই দেশে প্লেগ এসে আমার জামাতের হাজার হাজার শত্রুকে ধ্বংস করেছে। ভবিষ্যতের সংবাদা জানা নেই। এছাড়া এই নির্বাচিত মৌলবীদের অনেকে অন্ধ হয়ে যায় অনেকে কানা হয়ে যায়, কিছু উন্মাদ হয়ে যায় যার মধ্যে অনেকেই মারা যায়। সুতরাং এই দোয়া অনুসারে মৌলবী শাহ দ্বীন উন্মাদ হয়ে যায়। রশীদ আহমদ অন্ধ হয়ে যায়। মহম্মদ বখশ প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। লুধিয়ানার তিনজন মৌলবীই মারা যায়। মহম্মদ হাসানও মারা যায়। গোলাম দস্তগীর কসুরী মারা যায়। মহিউদ্দীন লাখোকে মারা যায়। আসগর আলির এক চোখের দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে যায়। মৌলবী মহম্মদ হোসেন 'আফফের' দোয়ার অধীনে চলে আসে।

(নুযুল মসীহ,রূহানী খাযায়েন খণ্ড-১৮, পৃ: ৫৩৪)

' মুনশী সাআদাল্লাহ্ লুধিয়ানবী কুকথা ও অপলাপের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করে নিজের কবিতা-নমায ও পঙক্তিতে আমাকে এত পরিমাণ গালি দিয়েছে যে, সে পাঞ্জাবে সকল অপলাপকারী শত্রুদের মধ্যে তার স্থান সবার উপরে। তখন আমি তার মৃত্যুর জন্য আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়া করি যে, সে যেন আমার জীবদ্দশাতেই অকৃতকার্য হয়ে লাঞ্ছনাজনক মৃত্যুর বরণ করে। তার গালির কারণেই এই দোয়া করা হয় নি, বরং মূল কারণ ছিল সে আমার মৃত্যু কামনা করছিল। ..... যদিও এই বাসনা প্রত্যেকে শত্রুর মধ্যেই পাওয়া যায়। তারা নিজেদের জীবদ্দশাতেই আমরা মৃত্যু দেখার জন্য লালায়িত ছিল। কিন্তু এই ব্যক্তি সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আমার স্মরণে নেই যে, পৃথিবী সৃষ্টি থেকে আজ অবধি নবী ও খোদার প্রত্যদিষ্টদেরকে কেউ এমন অশ্রাব্য গালি দিয়েছে, যেরূপ এই ব্যক্তি আমাকে দিয়েছে। এই সমস্ত কারণে আমি তার বিষয়ে দোয়া করি যে, আমার জীবদ্দশাতেই যেন তার ভাগ্যে অকৃতকার্যতা ও লাঞ্ছনার মৃত্যু আসে। খোদা তা'লা এমনটিই করেছেন। ১৯০৭ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহেই নিমোনিয়া প্লেগে আক্রান্ত হয়ে এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে হাজার হাজার অপূর্ণ বাসনা নিয়ে বিদায় নেয়।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ৪৩৫)

সত্য দাবি প্রতিটি আঙ্গিকে উদ্ভাসিত হয়

'সত্য ভিত্তিক দাবির সঙ্গে কেবল এক প্রকারেরই প্রমাণ থাকে না, বরং খাঁটি হিরের মত সেই দাবি চতুরঙ্গে উদ্ভাসিত হতে থাকে, যার প্রত্যেক খাঁজে দ্যুতির বিচ্ছুরণ ঘটে। অতএব আমি জোর গলায় বলছি, প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার আমার এই দাবি সেই মর্যাদার যা প্রতিটি আঙ্গিক থেকে উদ্ভাসিত হচ্ছে।'

(লেকচার লাহোর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ১৮৮)

অজস্র ঈমান উদ্দীপক উক্তিগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটি এখানে উপস্থাপন করা গেল। আল্লাহ্ সকলকে, বিশেষত আমাদের মুসলমান ভাইদের হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে চেনার এবং তাঁর উপর ঈমান আনার তৌফিক দান করুন। আমীন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

" হে মানবমণ্ডলী! শুনে রাখ! এটি তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী - যিনি পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজের এই জামাতকে সকল দেশে বিস্তৃত করে দিবেন এবং হুজ্জত ও সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী দলিল দ্বারা সকলের উপর তাদের বিজয় দান করবেন। ঐ দিন আসছে বরং ঐ দিন কাছে যখন পৃথিবীতে কেবলমাত্র এই একটি ধর্ম হবে যাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হবে। খোদা এই ধর্মকে এবং এই জামাতকে উচ্চ মর্যাদা ও অসাধারণ আশিসে বিভূষিত করবেন এবং যে কেউ একে শেষ করে দেওয়ার চিন্তা করবে তাকে ব্যর্থ করে দেওয়া হবে। এই বিজয় চিরকাল কায়েম থাকবে। এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে।"

(তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন, পৃ: ৬৭)